পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকর্তার শিক্ষাধারা অনুসারে সমগ্র বিদ্যালয়ের ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত। কলিকাতা গেজেট, ৫ই এপ্রিল, ১৯৫৪ দ্রষ্টব্য





মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি

নতুন পাঠশালা, নরখাদক, সন্ধান, সোনালি সকাল, চাঁদ ও বাঘ, মেট্রোপলিস, আরো দূর পথ, পরদেশী বালম্, দুর্বিপাক, চলচ্চিত্র, খেলাঘর, ইন্দ্রজাল, পড়াশুনা, আকাশ জয়ের গল্প ইত্যাদি প্রণেতা

বীরেন দাশ প্রণীত

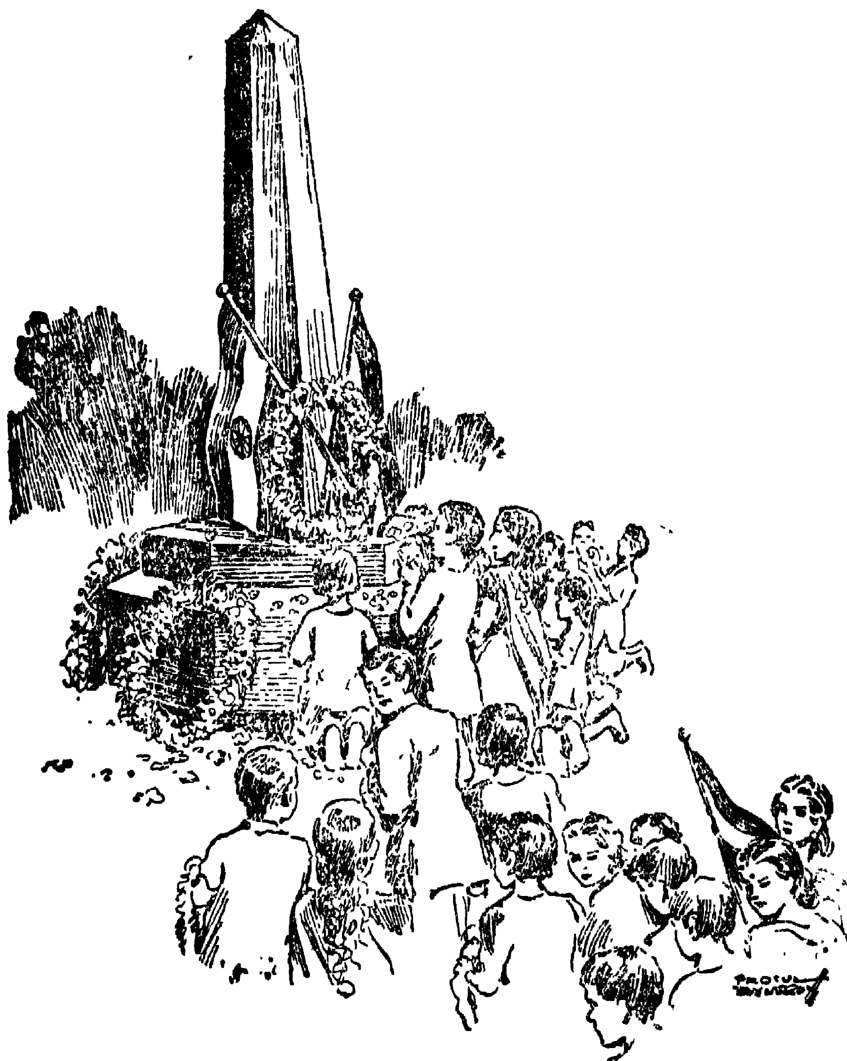
দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিঃ
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

রথযাত্রা
১৩৬৪
২

ছেপেছেন—
এস, সি, মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

দাম—
ছ'টাকা



লেখকের কথা

"মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি" ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড্ পিকচার্সের পরিবেশনায় রিপাবলিক পিকচার্স কর্তৃক "মহারাজা নন্দকুমার" নামক চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে।

প্রযোজক এস্, এল, কারণাণি ও বন্ধুবর শ্রীনারায়ণচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি এই গ্রন্থ রচনায় মুখ্যতঃ আমাকে অনুপ্রেরিত করেছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাঁর লাইব্রেরী আমাকে ব্যবহার করতে দিয়ে এবং কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ তথ্যাদি সরবরাহ করে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এঁদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

১৮এ, বাদুড় বাগান লেন
কলিকাতা—৯

বীরেন দাশ

উৎসর্গ

সাহিত্যিক ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু পণ্ডিত
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাভাজনেষু

সূচীপত্র

ঘটনা পঞ্জী

১৭০৫ খৃঃ নন্দকুমারের জন্ম।
১৭৫৬ খৃঃ হুগলীর ফৌজদার।
১৭৫৭ খৃঃ পলাশীর যুদ্ধ।
২৩শে জুন সিরাজের পরাজয়।
২৪শে জুন কর্ণেল ক্লাইব কর্তৃক মীরজাফরকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদ প্রদান।
১৭৫৮ খৃঃ কোম্পানীর দেওয়ান পদে নন্দকুমার।
১৭৬১ খৃঃ মীরজাফরের পদচ্যুতি ও কোম্পানী কর্তৃক মীরকাশেমকে মসনদ প্রদান।
১৭৬২ খৃঃ কোম্পানীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগে গবর্ণর ভ্যান্সিটার্ট কর্তৃক নন্দকুমার স্বগৃহে অন্তরীণ।
১৭৬৩ খৃঃ দ্বিতীয়বার মীরজাফরের নবাবী-প্রাপ্তি।
১৭৬৩ খৃঃ উধুয়ানালার যুদ্ধে নবাব মীরকাশেমের পরাজয় ও পলায়ন।
১৭৬৪ খৃঃ মীরজাফর কর্তৃক দেওয়ান নন্দকুমার বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান পদে নিযুক্ত।
১৭৬৫ খৃঃ নবাব মীরজাফরের মৃত্যু; বিদ্রোহের অভিযোগে কোম্পানী কর্তৃক নন্দকুমার গ্রেপ্তার ও বিনা-সর্ত্তে মুক্তিলাভ এবং দেওয়ানী হইতে পদচ্যুত।
১৭৬৯ খৃঃ গবর্ণর কার্টিয়ারের রাজত্বে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।
১৭৭৩ খৃঃ কার্টিয়ারের পদত্যাগ ও ওয়ারেন হেষ্টিংস কর্তৃক বাংলার শাসনভার গ্রহণ।
১৭৭৪ খৃঃ হেষ্টিংসের রাজত্বে ব্যাপক দুর্নীতি ও স্বৈরাচার; বিলাতে ক্লাইবের আত্মহত্যা; নন্দকুমার-হেষ্টিংস বিরোধ; নবগঠিত সুপ্রীম কাউন্সিলের সভ্য ক্লেভারিং ফ্রান্সিস ও মনসনের কলিকাতা আগমন ও কার্য্যভার গ্রহণ।
১৭৭৫ খৃঃ সুপ্রীম কাউন্সিলে নন্দকুমার কর্তৃক গবর্ণর হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণ ও অন্যান্য দুর্নীতির অভিযোগ; হেষ্টিংসের ষড়যন্ত্র; মোহনপ্রসাদ কর্তৃক নন্দকুমারের বিরুদ্ধে দলিল জালের ভুয়ো মামলা; হেষ্টিংসের বাল্যবন্ধু প্রধান বিচারপতি স্যার এলাইজা ইম্পে কর্তৃক নন্দকুমার গ্রেপ্তার; অজ্ঞাত-অখ্যাত ১২ জন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান জুরী ও সুপ্রীম কোর্টের জজ কর্তৃক নন্দকুমারের বিচার; আট দিন ব্যাপী অহোরাত্র বিচার-প্রহসন ও ফাঁসির আদেশ।
১৭৭৫ খৃঃ ৫ই আগষ্ট—প্রকাশ্য ময়দানে নন্দকুমারের ফাঁসি।

রিপাবলিক পিকচার্সের

মহারাজ নন্দকুমার

মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি অবলম্বনে গঠিত

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

বীরেন দাস

প্রধান ভূমিকায়

মহারাজ নন্দকুমার—অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
মীরজাফর—শম্ভু মিত্র
মীরকাশেম—নীতিশ মুখার্জ্জি
মণিবেগম—মঞ্জু দে
গুরুকন্যা—কবিতা সরকার
ক্ষেমাঙ্করী—অর্পণা দেবী
ক্লাইভ—হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়
হেষ্টিংস্—উৎপল দত্ত
ভ্যান্সিটার্ট—প্রমোদ গাঙ্গুলি
এডমাণ্ড বার্ক—মনোজ চ্যাটার্জ্জি
এলাইজা ইম্পে—পিয়ার্সন সুরিটা
মেরি হেষ্টিংস্—সোনিয়া ফ্রাঙ্ক
রায়দুর্লভ—কালী সরকার
উমিচাঁদ—তুলসী লাহিড়ী
স্বরূপচাঁদ—হরিধন বসু
জগৎশেঠ—বিপিন মুখার্জ্জি
বুলাকী দাস—তুলসী চক্রবর্ত্তী
গুরুদাস—শিবশঙ্কর
বাসুদেব—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রভৃতি

ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োতে রিভস্ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

একমাত্র পরিবেশক ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড্ পিকচার্স ঃ কলিঃ

চিত্রসূচী

চিত্র-সম্ভার

রিপাবলিক্ পিকচার্স ও প্রযোজক এস্, এল, কারণাণির সৌজন্যে

মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি—



রামপ্রসাদের গান শুনে নন্দকুমার স্থির থাকতে পারেন না।…

মহারাজ
নন্দকুমারের ফাঁসি

সিপাহ্‌শালার জাফর আলি! নবাব সিরাজদ্দৌল্লা করুণ মিনতিমাখা স্বরে বলতে লাগলেন। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে পলাশী রণাঙ্গনের প্রধান সেনানায়ক মীরজাফর। প্রস্তরমূর্ত্তির মত স্থির, ভাবলেশহীন। নবাবের করুণ আবেদন তাঁর কানে যেন পৌঁছায় নাই। সিরাজদ্দৌল্লা বলতে লাগলেন: সিপাহ্‌শালার জাফর আলি! আপনি আমার আত্মীয়, সম্পর্কে আমার গুরুজন। অতীতে যদি কোন অপরাধ করে থাকি, নিজগুণে ক্ষমা করুন। পলাশীর প্রান্তরে নবাবসৈন্যের সর্ব্বাধিনায়ক জাফর আলির আশ্রিত আমি আজ। বিপন্ন সিরাজদ্দৌল্লাকে সিপাহ্‌শালার কি রক্ষা করবেন না?

মীরজাফর তেমনি স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছেন।—জাফর আলি! কান্নায় তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে এল। কোথায় সেই উদ্ধত নবাব সিরাজদ্দৌল্লা—যাঁর ভয়ে মীরজাফরের অন্তরাত্মা একদিন থর থর করে কেঁপে উঠেছিল! সেদিন আর নেই। চাকা ঘুরে গেছে! আজ সিরাজই মীরজাফরের ভয়ে ভীত।

—যদি বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাবীই আপনার লক্ষ্য হয়, এই নিন উষ্ণীষ। সত্যি-সত্যিই নবাব রাজমুকুট খুলে

মীরজাফরের পায়ের কাছে রাখেন। তারপর গাঢ় স্বরে বলতে থাকেন :

—আমি অনভিজ্ঞ, চপলমতি যুবক। রাজ্যশাসনের যোগ্যতা আমার নেই। তক্ত মোবারকে আপনি বসুন।

মীরজাফর তেমনি স্থির, অচঞ্চল। নবাবের চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু টলমল করছে। এমন করুণ আবেদনে পাষাণেরও হৃদয় গলে যায়। কিন্তু জাফর আলি আজ পাষাণের চেয়েও কঠিন। বহুদিন থেকে তিনি এই মুহূর্ত্তেরই অপেক্ষা করছিলেন। সিরাজ বলতে লাগলেন : হ্যাঁ, তক্ত মোবারকে আপনিই বসুন।......অন্তত আলীবর্দ্দী খাঁর মুখ চেয়ে বাংলা বিহার উড়িষ্যার স্বাধীন মসনদ ইংরাজ বণিকের পায়ে বিলিয়ে দেবেন না।

সহসা মীরজাফরের মনে পড়ে, তিনি পরিখাবেষ্টিত নবাব-শিবিরের ভেতর একা। ইচ্ছে করলে নবাব তাঁকে বন্দী করতে পারেন। চমকে উঠলেন জাফর আলি। তাড়াতাড়ি কুর্ণিশ করে বললেন : হুজরৎ, মিথ্যাই বান্দাকে সন্দেহ করছেন। উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষায় আমি নবাবের সৈন্যবাহিনী নিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছি। বৃথা সৈন্যক্ষয় না করে ঠিক সময় ইংরাজসৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব।

সত্যি বলছেন! নবাব যেন অকূলে কূল পেলেন। জাফর আলির মুখ থেকে এ-টুকু সান্ত্বনার বাণীও শুনবেন নবাব আশা করেন নি।

—আমি নিজ হাতে আপনাকে রাজমুকুট পরিয়ে দিচ্ছি। জাফর আলি নবাবের পরিত্যক্ত উষ্ণীষ তাঁর মস্তকে পরিয়ে দিলেন।

কি ভেবে নবাব কোরাণ শরিফখানি এনে মীরজাফরের সামনে ধরে বললেন ঃ জাফর আলি, পবিত্র কোরাণ শরিফ স্পর্শ করে শপথ করুন, ইংরাজ ফিরিঙ্গির হাত থেকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার স্বাধীন মসনদ রক্ষা করবেন—সিরাজের জীবন রক্ষা করবেন।

সারল্য ও মূর্ত্তিমান রাজভক্তির প্রতীক সেজে জাফর আলি বললেন ঃ নিশ্চয়ই প্রতিজ্ঞা করব। অতীতে আমাদের ভেতর ঝগড়াঝাঁটি যাই হ'য়ে থাক, তা বলে ইংরাজের সঙ্গে যোগ দিয়ে নবাবের সর্ব্বনাশ করব—এতবড় বেইমান জাফর আলি হবে না। পবিত্র কোরাণ শরিফ স্পর্শ করে আমি শপথ করছি, পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজ ফিরিঙ্গিকে পরাস্ত করব, নয় ত প্রাণ দেব।

—খোদা আপনার মঙ্গল করুন!

মীরজাফর বললেন ঃ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন হজরৎ; পলাশীর যুদ্ধে জয় আমাদের সুনিশ্চিত। পঁয়ত্রিশ হাজার পদাতিক, পনের হাজার অশ্বারোহী, ৫৩টি কামান আমাদের। ক্লাইবের দলে মাত্র ন'শ ইংরাজসৈন্য, একুশটি কামান ও দু'হাজার এক'শ সিপাই। আমরা ওদের পিষে মারব না পিঁপড়ের মত!

কিন্তু মীরজাফর তাঁর প্রতিজ্ঞা রাখলেন না।

ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসে নবাবসৈন্য সেনাধ্যক্ষের আদেশের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। আস্তে আস্তে বেলা বাড়তে লাগল। মীরজাফর, ইয়ার-লতিফ ও রায় দুর্লভ চুপ-চাপ বসে রইলেন।

ওদিকে ইংরাজসেনা আম্রকুঞ্জ থেকে বেরিয়ে আসে। মীরমদন, মোহনলাল ও ফরাসী সেনাপতি সিনফ্রে তাঁদের অধীনে অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে আম্রকুঞ্জের দিকে এগিয়ে যান। সেনাপতি সিনফ্রের সৈন্যরাই প্রথম গোলাবর্ষণ সুরু করে। তিনঘণ্টা যুদ্ধ চলবার পর ইংরাজসেনা পিছু হটে আম্রকুঞ্জে গা-ঢাকা দিতে সুরু করল। সম্মুখ সমরে জয়লাভের কোন আশা নাই, তাই ক্লাইব স্থির করলেন, রাতের অন্ধকারে নবাব-সৈন্যের পশ্চাদ্‌ভাগ আক্রমণ করবেন।

সহসা এক পশলা বৃষ্টি হয়ে নবাবের গোলাবারুদ ভিজে যায়। এ অবস্থায় ইংরাজদের আগেই ছত্রভঙ্গ করতে না পারলে পরাজয় সুনিশ্চিত। বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরমদন একদল অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ইংরাজসেনার উদ্দেশে ধাওয়া করলেন। কিন্তু নবাবের দুর্ভাগ্য, ইংরাজসেনার গোলার আঘাতে তিনি প্রাণ দিলেন।

তাঁবুর ভেতরে নবাবের কানে সব খবরই আসে। হাহাকার করে উঠেন নবাব : মীরমদন! মীরমদন!

দূত কুর্ণিশ করে বলে : হজরৎ! বীর মোহনলাল মীরমদনের স্থান নিয়েছেন। মোহনলালের অশ্বারোহী দল ইংরাজবাহিনীর পশ্চাদ্‌ভাগ দলিত মথিত করতে সুরু করেছে।

ছুটে আসেন মীরজাফর নবাবের তাঁবুতে। কুর্ণিশ করে বলেন: জাঁহাপনা! আমি আজকের মত যুদ্ধ বন্ধ রাখতে চাই। সেনাপতি মোহনলালকে যুদ্ধ বন্ধ করতে আদেশ দিন। বেকুবের মত লড়াই করে সৈন্যক্ষয় করার কোন অর্থ হয় না।

হতবুদ্ধি, বিভ্রান্ত নবাব মোহনলালকে ডেকে পাঠান। কোরাণ শরিফ স্পর্শ করে জাফর আলি প্রতিজ্ঞা করেছেন, সিরাজ কি তাঁকে আর অবিশ্বাস করতে পারেন?

মোহনলাল কুর্ণিশ করে বলেন: জাঁহাপনা! যুদ্ধ একবার বন্ধ করলে, নবাবসৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে। ইংরাজ এই সুযোগের অপেক্ষায় আছে। ছত্রভঙ্গ নবাবসেনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে, জয় তাদের অনিবার্য্য।

তবে যে জাফর আলি বলছেন—নবাব ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে জাফর আলির দিকে তাকান।

জাফর আলি উদাস স্বরে বলেন: যা ভাল মনে করছি, সেই উপদেশই দিচ্ছি। আমার পরামর্শ অনুসারে কাজ করা না-করা নবাবের ইচ্ছা।

হতভাগ্য নবাব জাফর আলিকে আর অবিশ্বাস করতে পারেন না। কোরাণ শরিফ ছুঁয়ে শপথ করেছেন!

—সিপাহ্‌শালার রণনীতি আপনাদের চেয়ে ভাল বোঝেন। যুদ্ধ আজকের মত বন্ধ রাখুন।

মোহনলাল কুর্ণিশ করে বললেন: নবাবের আদেশ শিরো-

থার্য্য। কিন্তু সব জেনে শুনে মোহনলাল এ বেইমানি সহ্য করতে পারবে না। নবাবের কাজে আমি ইস্তফা দিলাম।

মোহনলাল পিছিয়ে পড়তেই, নবাবসৈন্য ছত্রভঙ্গ হতে লাগল। সুযোগ বুঝে ইংরাজসেনা আমবাগান থেকে বেরিয়ে এসে নবাবসৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মীরজাফর, রায়দুর্লভ ও ইয়ার-লতিফের সেনারা যুদ্ধ করলে না। পলাশীর প্রান্তরে নবাবের হয়ে যুদ্ধ করলেন শুধু একজন বিদেশী সেনাপতি। ফরাসী বীর সিনফ্রে নিজের অধীনে মুষ্টিমেয় গোলন্দাজ সৈন্য নিয়ে আপ্রাণ যুদ্ধ করেও কিন্তু ইংরাজসেনার গতিরোধ করতে পারেন নি।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন বৃহস্পতিবার বিকাল পাঁচটায় ইংরাজসেনা নবাবের পরিখাবেষ্টিত শিবির অধিকার করে পলাশী বিজয় করল।

হতভাগ্য নবাব

যুদ্ধ শেষ হবার আগেই নবাব উটের পিঠে চড়ে মুর্শিদাবাদে পালিয়ে গেলেন। ভীত, বিভ্রান্ত সিরাজ রাজধানীর দ্বারে দ্বারে সাহায্য প্রার্থনা করে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু বৃথাই! ক্লাইব ও মীরজাফরের ভয়ে কেউ তাঁকে সাহায্য করতে রাজী হল না। ইংরাজসেনার সঙ্গে যুদ্ধ করে নগর রক্ষা করার আশা সুদূরপরাহত হয়ে উঠল। বন্ধুর বেশে মীরজাফরের দল পরামর্শ দিলে—পালাও! পালাও!

রাত যত গভীর হচ্ছে, রাজধানীর পথে মীরজাফরের অনুগামী নাগরিকদের সানন্দ কোলাহল ততই বাড়ছে। দূরে, পলাশীর পথে ইংরাজসৈন্যের রণবাদ্য ও বিজয়োল্লাস, নিশীথ-রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করে থেকে থেকে ভেসে আসছে—পালাও ...পালাও...যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, পালিয়ে যাও। ইংরাজের হাতে একবার ধরা পড়লে আর রক্ষা নাই।

প্রাণভয়ে ভীত নবাব তখন সহগামী খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু আত্মীয়, বন্ধু, বেগম, নবাবের কাকুতি-মিনতি কেউ শুনলো না। নবাবের সহগামী হয়ে শেষকালে কি ইংরাজ ফিরিঙ্গির হাতে প্রাণ দেবে তারা। একজন শুধু সিরাজকে ফিরিয়ে দিলেন না। নবাবের প্রিয়তমা মহিষী লুৎফুন্নেসা বেগম।

বাংলা বিহার উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব, বেগম লুৎফুন্নিসার হাত ধরে রাতের অন্ধকারে চোরের মত লুকিয়ে রাজধানী ত্যাগ করলেন। সঙ্গে তাঁদের চার বছরের শিশুকন্যা উম্মত জহরা।

নবাবের প্রাণ ভয়ে কণ্ঠাগত। গভীর রাতের নির্জ্জন অন্ধকার পথ। আশে পাশে কোথাও শব্দ উঠলেই মনে হয়, ঐ বুঝি মীরজাফরের চর তাঁকে ধরতে আসছে! এ-ভাবে সারারাত চলবার পর পরদিন তাঁরা ভগবানগোলা উপস্থিত হন। সেখান থেকে নৌকাযোগে রাজমহলের পথে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও উৎকণ্ঠায় তিনদিন তিনরাত কাটিয়ে, অবশেষে নবাব ধরা পড়লেন।

দানশা নামে জনৈক ফকির, নবাব সিরাজদ্দৌল্লাকে মীর-কাশেমের অনুচরদের নিকট ধরিয়ে দিলে। সেখান থেকে তাঁকে বন্দী করে জাফরগঞ্জ প্রাসাদে নিয়ে আসা হল। মীরজাফর-পুত্র মীরণের আদেশে ঘাতক মোহাম্মদী বেগের তরবারির আঘাতে স্বাধীন বাংলার শেষ নবাব সিরাজদ্দৌল্লা নিহত হলেন।

মীরজাফর

তক্ত মোবারক নিষ্কণ্টক। অহিফেনসেবী বৃদ্ধ জাফর আলি দুরু দুরু বক্ষে শূন্য সিংহাসন আগলে অপেক্ষা করতে লাগলেন, কখন ক্লাইব সাহেব সদলবলে এসে তাঁকে নবাব বলে ঘোষণা করেন। কে জানে ক্লাইবের মনে কি আছে!

এদিকে পলাশী ষড়যন্ত্রের অন্যতম নেতা, জগৎশেঠও চুপ-চাপ। ক্লাইব না আসা পর্য্যন্ত মীরজাফরের সঙ্গে একবার দেখা করার প্রয়োজনীয়তা আছে, শেঠেরা মনে করেন না। জাফর আলির চাইতে ক্লাইবই যেন ওঁদের বেশী আপনার! অবশেষে ২৯শে জুন দু'শ গোরা ও তিন'শ সিপাই নিয়ে ক্লাইব রাজধানী প্রবেশ করলেন। মীরজাফর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে, ক্লাইব তাঁকে 'বঙ্গেশ্বর' বলে সম্বোধন করলেন। মীরজাফর এতখানি আশা করেন নি। আহ্লাদে আটখানা হয়ে তিনি প্রাসাদে ফিরলেন।

পরদিবস প্রকাশ্য দরবারে ক্লাইব জাফর আলিকে হাত ধরে তক্ত মোবারকে বসিয়ে দিলেন। নবাব বলে ঘোষণা করলেন তাঁকে। My friends! বন্ধুগণ! ক্লাইব বলতে লাগলেন: নবাব সিরাজদ্দৌল্লা ইংরাজ শক্তিকে ধ্বংস করতে চাহিয়াছিল। Through the grace of God, সে নিজেই ধ্বংস হইয়াছে। হামিলোগ peace-loving traders—শান্তিপ্রিয় বণিক!

রাজ্য বিস্তার করিতে চাই না। নবাব জাফর আলি খাঁর শাসন-কার্য্যে হামিলোগ হস্তক্ষেপ করিবে না।

মীরজাফরের মনে আর আনন্দ ধরে না। ভাবেন, কর্ণেল ক্লাইবের মত বন্ধু আর হয় না।

সেদিনই মীরজাফরের উপস্থিতিতে ক্লাইব ও তাঁর অনুচরেরা সিরাজের ধনাগার লুঠ করলেন। কিন্তু এতে তাঁদের ধনতৃষ্ণা মিটল না।

পরদিন জগৎশেঠের বাড়ীতে বৈঠক বসল।

সেদিনকার সভায়, নবাব মীরজাফর, মীরণ, ক্লাইব, ওয়াটস্, স্ক্রাফটন্, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, স্বরূপচাঁদ, রাজবল্লভ ও উমিচাঁদ উপস্থিত ছিলেন। পলাশী যুদ্ধের আগে মীরজাফরের সঙ্গে ইংরাজের যে গোপন-চুক্তি হয়েছিল, তার সর্ত্ত অনুসারে ইংরাজ নবাবের নিকট বহু টাকা দাবী করে বসল।

প্রথমেই শ্রেষ্ঠী উমিচাঁদ বলতে লাগলেন: আজ আমার বড় সৌভাগ্যের দিন। আমারই মধ্যস্থতায় নবাব জাফর আলির সঙ্গে কোম্পানীর গোপন-চুক্তি হয়েছিল। আজ জাফর আলি নবাবী গদীতে বসেছেন—সাহেবরা তাঁদের পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিচ্ছেন। এ ব্যাপারে সেদিন মধ্যস্থ ব্যক্তি হিসাবে কাজ করবার জন্য আমার পারিশ্রমিক স্থির হয়েছিল তিরিশ লক্ষ টাকা। এইবার ক্লাইব সাহেব আশা করি আমার পাওনা মিটিয়ে দেবেন।

ইংরাজ ফিরিঙ্গির বন্ধু উমিচাঁদ বা আমিনচাঁদ। ইংরাজ

যখন ফরাসী চন্দননগর অবরোধ করে, ফরাসীদের সাহায্য করবার জন্য হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমারের নিকট নবাব সিরাজদ্দৌল্লা একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। শ্রেষ্ঠী উমিচাঁদ ইংরাজের হয়ে ফৌজদার নন্দকুমারের নিকট ওকালতি করতে ছুটলেন। ইংরাজ ফিরিঙ্গির প্রবল প্রতাপ ও দুর্জ্জয় শক্তির কথা তিনি নন্দকুমারের নিকট বর্ণনা করে বললেনঃ ফরাসীরা ইংরাজের তোপের মুখে টিকতে পারবে না—কেন মিছিমিছি নবাব বদনামের ভাগী হবেন?

নন্দকুমার ভুল বুঝলেন। তিনি নবাবকে লিখলেনঃ ফরাসীরা ইংরাজের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে অসমর্থ। নবাবসৈন্য ফরাসীদের পক্ষে যোগ দিলে, আপনার বিজয়-পতাকার অবমাননা সুনিশ্চিত।

নবাবের আদেশ অমান্য করবার অপরাধে নন্দকুমার পদচ্যুত হলেন।

কিন্তু উমিচাঁদের এর চেয়েও বড় কীর্ত্তি মুর্শিদাবাদে। শেঠেদের মধ্যস্থতায় মীরজাফর ও কোম্পানীর ষড়যন্ত্র যখন পাকাপাকি হয়ে এসেছে, উমিচাঁদ বেঁকে বসলেন। নবাব সিরাজদ্দৌল্লার সঞ্চিত ধনের এক-চতুর্থাংশ তাঁকে দেওয়া হবে, এই মর্ম্মে লেখাপড়া না করলে, উমিচাঁদ ষড়যন্ত্র নবাবের নিকট ফাঁস করে দেবেন! তখন অনেক দর কষাকষির পর স্থির হল, উমিচাঁদকে ধনাগার থেকে নগদ তিরিশ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে।

ওয়াট্‌স্ এসব কথা ক্লাইবকে লিখলেন। ক্লাইব ভাবলেন, এতগুলো টাকা মিছিমিছি উমিচাঁদ পাবে? অথচ লোকটাকে হাতছাড়া করাও যায় না। অনেক ভেবেচিন্তে ক্লাইব এক মতলব আঁটলেন। তু'খানি সন্ধিপত্র তৈরী করা হল। একখানি সাদা কাগজে, একখানি লাল কাগজে। সাদাখানি আসল। এতে উমিচাঁদের পাওনার কথা লেখা হল না। ওয়াট্‌স্ সই করলেন।

লাল কাগজে লিখিত সন্ধিপত্র নকল। সাদা কাগজে যা লেখা ছিল, লাল কাগজে তার সব কিছুই কপি করা হল—অধিকন্তু উমিচাঁদের পাওনার কথাও ওতে লেখা হল। এই নকল সন্ধিপত্রে সবাই সই করলেন, কিন্তু সেনানী ওয়াট্‌স্ সই করতে রাজী হলেন না। তখন ক্লাইবের পরামর্শে লুজিটন নামে জনৈক ইংরাজ ওয়াট্‌সের নাম জাল করলেন। উমিচাঁদ এর কিছুই জানতেন না।

শেঠেদের বাড়ীর বৈঠকে ভাগাভাগির সময় উমিচাঁদ সেই তিরিশ লক্ষ টাকা চাইতেই ওয়াট্‌স্ বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন: কিসের চুক্তিপত্র? হামি কিছু জানে না।

ক্লাইব সায় দিয়ে বললেন: Certainly, তোমার কিছুই পাওনা নাই।

উমিচাঁদের মুখে কথা সরে না। সাহেবেরা কি বলতে চায়!

ক্লাইব তখন সাদা কাগজে লেখা চুক্তিপত্রখানি বার করে

বললেন : এই ত সেই চুক্তিপত্র। ইহাতে তোমার পাওনার কথা কিছু লেখা নাই।

থামো সাহেব! উমিচাঁদ বাধা দিয়ে বললেন : এ আমাকে কোন্ কাগজ তুমি দেখাচ্ছ! এ ত সাদা কাগজ! সেদিন তোমরা আমায় লাল কাগজে লেখা চুক্তিপত্র দেখিয়েছিলে।

ক্লাইব বললেন : তা দেখাইয়াছিলাম। কিন্তু লাল কাগজে লেখা চুক্তিপত্র জাল। উহাতে ওয়াট্‌স্ সহি করেন নাই। সাদা কাগজের চুক্তিপত্রে ওয়াট্‌স্ সহি করিয়াছেন। ইহাই আসল। তুমি কিছুই পাইবে না।

ক্লাইব ও ওয়াট্‌সের কারসাজি বুঝতে দেরী হল না উমিচাঁদের। এ-ও তিনি বুঝতে পারলেন, সামান্য তিরিশ লক্ষ টাকার লোভে নবাব সিরাজদ্দৌল্লার তিনি সর্ব্বনাশ সাধন করেছেন!

এঁ্যা! আমি কিছু পাব না! আর্ত্তকণ্ঠে উমিচাঁদ বলতে লাগলেন : তিরিশ লক্ষ টাকার জন্য এত বড় জালিয়াতি আমার সঙ্গে করলে সাহেব!···হায়! হায়! এ আমি কি করলাম! মাত্র তিরিশ লক্ষ টাকার জন্য বাংলা বিহার উড়িষ্যার স্বাধীন মসনদ ইংরাজ ফিরিঙ্গির কাছে বিক্রী করলাম! আমি মহা-পাপী! পাপীকে শাস্তি দাও ভগবান!

দু'হাতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে উমিচাঁদ অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। অনুচরেরা এসে তাঁর সংজ্ঞাহীন দেহ তুলে নিয়ে গেল।

সভাগৃহে এক মুহূর্ত্ত কারো মুখে কথা নেই।

Gentlemen! অবশেষে ওয়াট্‌স্‌ নীরবতা ভাঙ্গলেন : Let us come to business. নবাব জাফর আলি খাঁ! হাপনি নবাবী পাইয়াছে! এইবার হামাদের সম্পূর্ণ পাওনা মিটাইয়া দিন। রাজকোষে হামি যাহা পাইল, ইহাতে পাওনার এক-তৃতীয়াংশ শোধ হইল না।

মীরজাফর—আমার আর্থিক অবস্থার কথা ত আপনাদের অজানা নয়, কর্ণেল সাহেব!

ওয়াট্‌স্‌—তংকা না থাকে শেঠেদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করুন।

জগৎশেঠ—এ অনুরোধ আমাদের করবেন না হজরৎ! আমাদের হাতে উদ্বৃত্ত টাকা কোথায় যে নবাব-সরকারে নতুন করে টাকা ধার দেব?

মীরজাফর—তাহলে কি উপায় হবে?

ওয়াট্‌স্‌—You must pay our dues. হামিলোগ কোন কথা শুনিবে না।

মীরণ—বটে! রাজকোষ লুটে নিয়েও তোমাদের ক্ষুধা মিটল না?

মীরজাফর—তুমি থামো মীরণ।

ক্লাইব—শুনিয়াছে late নবাব was fabulously rich in jewels. সিরাজের গুপ্ত ধনাগারের সন্ধান হামি পাইল না! নবাব জাফর আলি কি গুপ্ত ধনাগারের কথা শোনেন নাই?

সিরাজের গুপ্ত ধনাগারের প্রসঙ্গটা যাতে না উঠে, এতক্ষণ মীরজাফর তার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু প্রসঙ্গটা আর চাপা দেওয়া গেল না। জগৎশেঠ ইংরাজের পক্ষে সায় দিলেন। বললেন: সিরাজের গুপ্ত ধনাগারের কথা কে না জানে নবাব! সাহেবদের দাবী যুক্তিযুক্ত। পাওনা ওদের মিটিয়ে দেওয়াই উচিত।

মীরজাফর মুখ ফিরিয়ে বসে রইলেন।

রায় দুর্লভ—আপনার নিজের অবস্থা একবার বিবেচনা করুন হজরৎ! যদিও আপনি তক্তে বসেছেন, দেশের লোক আজো আপনাকে নবাব বলে স্বীকার করে নি। এই অবস্থায় কর্ণেল সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করা কি উচিত হবে?

মীরজাফর চমকে উঠলেন। তাইত! রায় দুর্লভ খাঁটী কথাই বলেছেন। না না, ইংরাজের সঙ্গে এখন ঝগড়া-ঝাঁটি করবার সময় নয়। মীরজাফর মীরণকে হুকুম দিলেন: সাহেবদের গুপ্ত ধনাগারে নিয়ে যাও।

ক্লাইব ও ওয়াট্‌স্ আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন: You are truly a great Nawab!

জগৎশেঠ বললেন: নবাবের উদার মনের প্রশংসা করতে হয়!

উদারতা! মীরজাফর দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন।

রায় দুর্লভ বললেন: কেন ভাবছেন হজরৎ! মণিমুক্তো

হীরে জহরৎ দিয়ে অন্ততঃ অর্দ্ধেক ঋণ ত শোধ হবে। কর্ণেল সাহেবকে বলে বাকীটা কিস্তিবন্দী করিয়ে দেব!

রায় দুর্লভের আশ্বাস-বাণীতে মীরজাফর কতখানি আশ্বস্ত হয়েছিলেন সেদিন, বলা শক্ত। কিন্তু তিনি এ-কথা ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলেন, ইংরাজ সিরাজের গুপ্ত ধনাগার লুঠ করেই সন্তুষ্ট হবে না।

ক্লাইব ও তাঁর অনুচরেরা নৌকোর পর নৌকো সোনা রূপা হীরে জহরৎ মণিমুক্তোয় ভর্ত্তি করে মুর্শিদাবাদ থেকে প্রথমে কলকাতায় চালান দিলে—সেখান থেকে বিলাতে।

মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি—



সামসেরের অনুচরও তেড়ে গেল : ব্যাটা লালমুখো বাঁদর ! তুই চুপ্ কর। বেয়াদবি করে করে আজকাল তোদের বড্ড বাড় হয়েছে, না ? এই সেদিনও ভয়ে, দিনের বেলা পথে বেরোবার সাহস ছিল তোদের ?

আর এক গোরা এগিয়ে এল : হামিলোগ Battle of Plassy জয় করিয়াছে। বুড্ডা নবাবকে তক্তে বসাইয়াছে। বুডডা নবাব কর্ণেল সাহেবের গোলাম।

মীরজা সামসেরের অনুচর আর সইতে পারে না। ঝাঁপিয়ে পড়ে গোরার উপর। দুপক্ষেই দলে ভারী ছিল। রাজপথে রীতিমত এক পশলা মারামারি হয়ে যায়। গোরার দল শেষ-পর্য্যন্ত রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যায়।

সব শুনে মীরজাফর ত' রেগেই কাঁই। ছি ছি! এসব কথা কর্ণেল সাহেবের কানে গেলে তিনি কি ভাববেন ! নবাব সামসেরকে ডেকে পাঠালেন।

পাত্র-মিত্র নিয়ে নবাব তখন মাধ্যাহ্নিক অবসর যাপন করছিলেন। মীরজা সামসের কুর্ণিশ করে সামনে এসে দাঁড়ালেন। সামসের নবাবের পুরানো দোস্ত। তা ছাড়া খুবই বিশ্বস্ত। তাই মীরজাফর ক্রোধ সামলে নিয়ে বললেন : আমি নিজে যাকে এত সম্মান করি, সেই ক্লাইব সাহেবের অনুচরদের কোন সাহসে আপনি অপমান করেন, মীরজা সামসের ?

সামসের কুর্ণিশ করে বললেন : কিছুই হজরতের অবিদিত নয়।

মীরজাফর—আমি জানি সবই। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে কেন, ওরা সাহেবের জাতি। ওদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করা আমাদের অনুচিত।

সামসের—সাহেবের জাতি, অতএব আমাদের নমস্য।

মীরজাফর এবার বিরক্তস্বরে বললেন ঃ আচ্ছা, সত্যি করে বলুন ত' মীর্জ্জা সাহেব, আপনি কি আজও কর্ণেল ক্লাইবের শক্তি সামর্থ্য,—তার পদমর্য্যাদা অবগত হননি ?

সামসের—সে কি কথা জাঁহাপনা ! হুজরতের দোস্ত, কর্ণেল সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি কি কখনো কথা বলতে পারি ? তিনি কত উঁচুতে ! রোজ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই আমি ক্লাইবের গর্দ্দভকেও তিনবার সেলাম করি !

মীরজাফর অন্যমনস্ক স্বরে বললেন ঃ তা ত' বটেই।

পাত্র-মিত্রেরা হো হো করে হেসে উঠল। চমক ভাঙ্গল নবাবের। বললেন ঃ কি, কি বললেন ? আমি তাহলে ক্লাইবের গর্দ্দভ !

তার হাত থেকে আফিমের কৌটো পড়ে গেল। মন্ত্রণাঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন নবাব।

সামসের প্রদত্ত নবাবের নতুন উপাধি মুর্শিদাবাদ দরবারে এত ছড়িয়ে পড়েছিল যে, পরবর্ত্তী যুগে ইংরাজ ঐতিহাসিকও মীরজাফরকে ক্লাইবের গর্দ্দভ বলতে দ্বিধা করেন নি।

ক্লাইব সাহেব সামনে এসে দাঁড়ালেই নবাব গদগদ স্বরে বলে উঠতেন ঃ কর্ণেল সাহেব ! আপনি আমার দোস্ত। আপনি আমার দোস্ত ! আপনি যা বলবেন, তাই হবে, তাই হবে।

নন্দকুমার

রাষ্ট্রবিপ্লবের এই চরম দুর্দ্দিনে সবাই যখন নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে ব্যস্ত, একজন শুধু নিরপেক্ষ দর্শকের মত দূরে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি হুগলীর পদচ্যুত ফৌজদার নন্দকুমার।

এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণবংশে নন্দকুমারের জন্ম। অল্প বয়সেই তিনি সংস্কৃতের সাথে সাথে পারস্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। নন্দকুমারের পিতা পদ্মনাভ আমীনের কাজ করতেন। পুত্রকে তিনি রাজস্ব-সংগ্রহ, হিসাব-পত্র রাখা প্রভৃতি কাজে পারদর্শী করে তোলেন। এরপর তিনি জমিদারী সেরেস্তার কাজেও দক্ষ হন। পিতার অধীনে নন্দকুমারের কর্ম্মজীবন স্থরু হয়। নবাব আলীবর্দ্দি খাঁর অধীনে তিনি কিছুকাল রাজস্ব-সংগ্রহের কাজ করেন। পরে তিনি হুগলীর ফৌজদার পদে নিযুক্ত হন। কি অবস্থায় নবাব সিরাজদৌল্লা তাঁকে পদচ্যুত করেন, সেকথা আগেই বলেছি। উমিচাঁদের প্ররোচনায় ফরাসীদের সাহায্য না করে তিনি যে ভুল করেছিলেন, সে ভুলের জন্য ইতিহাস তাঁকে কোনদিন ক্ষমা করবে না—নন্দকুমার এ-কথা বুঝতে পেরেছিলেন।

বিখ্যাত পণ্ডিত বাসুদেব শাস্ত্রী ছিলেন নন্দকুমারের গুরু। পরমার্থিক বিচার ছাড়াও সাংসারিক বিষয়ে নন্দকুমার গুরুদেবের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। বাসুদেব জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন।

অনেকদিন পরে, সেদিন তিনি গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

গুরুকন্যা প্রমদা প্রাঙ্গণে পূজোর ফুল তুলছিলেন। নন্দকুমারকে দেখে প্রমদা খুসীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন: দাদা! কতকাল পরে এলেন, বলুন ত'! নন্দকুমার স্মিত হেসে জিজ্ঞাসা করলেন: শ্বশুরবাড়ী থেকে কবে এলে প্রমদা? তোমার গায়ে গয়না-পত্র নেই কেন?

প্রমদা বললেন: আমরা গরীব গেরস্থ মানুষ, গয়না-পত্র কোথায় পাব দাদা! বড়লোক দাদা ত' বিয়েতেই এলেন না, পাছে গরীব বোনকে গয়না-পত্র দিতে হয়!

নন্দকুমার বললেন: সেবারে কাজে এমন জড়িয়ে পড়লাম, ইচ্ছাসত্ত্বেও বিয়েতে আসা হল না। তা কিছুদিন থাকবে ত'?

থাকব। প্রমদা বললেন: তা আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ভেতরে এসে বসুন।

গুরুদেব কোথায়? নন্দকুমার বললেন: আগে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করে আসি।

বাবা মন্দিরে গেছেন। প্রমদা বললেন: আপনি বসুন, না, উনি এক্ষুণি ফিরবেন।

না প্রমদা, নন্দকুমার বললেন: গুরুদেবের সঙ্গে আমার জরুরী কাজ। আমি মন্দিরেই যাচ্ছি। বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে পরে একদিন আসব কিন্তু।

বাসুদেব তখন মন্দিরে পূজোর আয়োজন করছিলেন। নন্দকুমারকে দেখে স্মিত হেসে বললেন : নন্দকুমার যে!

ভক্তিভরে গুরুদেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে নন্দকুমার আসন গ্রহণ করলেন।

বাসুদেব—তারপর হঠাৎ?

নন্দকুমার—আপনি অন্তর্য্যামী।

এক মুহূর্ত্ত কি ভেবে বাসুদেব বললেন : আমি জানি নন্দকুমার—কৃতকর্ম্মের জন্য তুমি অহর্নিশ অনুশোচনায় ভুগছ। সেদিন চন্দননগরে ফরাসী ও নবাবসৈন্যের হাতে ইংরাজ-শক্তি পরাজিত ও বিধ্বস্ত হলে, হয়ত, পলাশীর যুদ্ধই হত না। কিন্তু, নিয়তি কেন বাধ্যতে!

নন্দকুমার—উমিচাঁদের কুমন্ত্রণায় আমি এ-কাজ করেছিলাম গুরুদেব!

বাসুদেব—বটেই ত'! আর সেই কারণেই ক্লাইব তোমাকে দেওয়ান নিযুক্ত করতে চান। যাই বল না কেন, ক্লাইবের কৃতজ্ঞতা বোধ আছে। হা হা হা!

বৃদ্ধ বাসুদেব শাস্ত্রী অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। সে হাসির বিদ্রূপটুকু নন্দকুমারকে বিঁধল। কিন্তু তিনি চুপ করে রইলেন।

বাসুদেব বলতে লাগলেন : তোমার জন্মপত্রিকা যতদূর আমি বিচার করেছি, তাতে মনে হয় তুমি বেইমান নও। বেইমানি তুমি কারো সঙ্গে করতে পারবে না বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু চন্দননগরে ইংরাজ ফিরিঙ্গিকে বাধা না দিয়ে

এত বড় ভুল তুমি কেমন করে করলে, আমি শুধু তাই ভাবি। যাকগে ও-কথা। ক্লাইবের অধীনে তুমি কাজ করতে চাও?

নন্দকুমার—আপনি যদি অনুমতি দান করেন।

বাসুদেব—অনুমতি? আমি অনুমতি দেবার কে নন্দকুমার? নিয়তি তোমাকে সেখানে টেনে নিয়ে যাবে।

নবাব মীরজাফর কোম্পানীর দাবী মেটাতে না পেরে, বর্দ্ধমান, নদীয়া ও হুগলীর রাজস্ব সংগ্রহ করবার ভার ইংরাজ ফিরিঙ্গিদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। বিদেশী বণিক ইংরাজের পক্ষে এ-দেশীয় কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য ছাড়া রাজস্ব আদায় করা সম্ভব নয়। সে-যুগে নন্দকুমারের ন্যায় রাজস্ব-বিভাগে পারদর্শী কেউ ছিলেন না। ক্লাইব তাই কোম্পানীর তরফ থেকে নন্দকুমারকে তহশীলদার নিযুক্ত করবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

কাজে যোগ দেবার আগে নন্দকুমার গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ নিতে এসেছেন। কিন্তু গুরুদেবের কথাবার্ত্তা থেকে তাঁর কেমন সন্দেহ হয়।

নন্দকুমার—আপনি কি আমায় ইংরাজের সংশ্রব ত্যাগ করতে উপদেশ দিচ্ছেন, গুরুদেব?

বাসুদেব—না। এই ত' সুরু হল ইংরাজ ফিরিঙ্গিদের আমল। এখন তোমাকে কিছুকাল ইংরাজের সংশ্রবে থেকে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। কেননা, ইংরাজ যাকে সম্মান করবে, দেশের লোকের দৃষ্টি তার উপর পড়বে।

নন্দকুমার—কিন্তু গুরুদেব !

বাসুদেব—এ-ও আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, বেশীদিন তুমি ইংরাজের অধীনে কাজ করতে পারবে না। দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। সামনে বড়ই দুর্দ্দিন। ঐ ইংরাজ ফিরিঙ্গির অত্যাচারে একদিন সারাদেশ জর্জ্জরিত হয়ে উঠবে।

নন্দকুমার—গুরুদেব, এর কি কোন প্রতিবিধান নেই ?

বাসুদেব—হয়ত আছে, হয়ত নেই। কে জানে, হয়ত একদিন তুমিই দেশবাসীর প্রতি কোম্পানীর অত্যাচার সইতে না পেরে রুখে দাঁড়াবে ইংরাজের বিরুদ্ধে।

নন্দকুমার—আশীর্ব্বাদ করুন গুরুদেব, আমার জীবনে যেন সত্যিই সে সুযোগ আসে।

বাসুদেব—হুঁ। নন্দকুমার তুমি আমার প্রিয় শিষ্য। ছেলের মতই আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি তোমায় বারণ করছি নন্দকুমার, কোম্পানীকে বেশী ঘাঁটিও না। ইংরাজ ফিরিঙ্গি থেকে যেমন তোমার ভাগ্যোন্নতি হবে, তেমনি সর্ব্বনাশও হতে পারে। হ্যাঁ, সাবধানে থেকো।

প্রমদার যৌতুক

সেদিন গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে, প্রমদাকে দেখে কথাটা নন্দকুমারের মনে পড়ল। গুরুকন্যা প্রমদার বিয়েতে তিনি যেতে পারেন নি, কিন্তু তা বলে যৌতুকটা ত' পাওনা রয়েছে! বাসুদেবের আর্থিক অবস্থা ত' নন্দকুমারের অজানা নয়। মেয়েকে তিনি কিই বা দিতে পারেন! তা ছাড়া প্রমদার বিয়ে হয়েছে মধ্যবিত্ত ঘরে। প্রমদার গায়ে যদি তেমন কিছু গহনা-পত্র না থাকে তাতে আর আশ্চর্য্য কি!

বাড়ী ফিরে পত্নী ক্ষেমঙ্করী দেবীকে সেদিন সব কথা বললেন নন্দকুমার। ক্ষেমঙ্করী বললেন: তুমি কালই যাও মুর্শিদাবাদে। প্রমদার জন্য কিছু জহরৎ কিনে নিয়ে এস। ওকে আমরা যৌতুক না দিলে, কে দেবে?

সত্যি সত্যিই নন্দকুমার মুর্শিদাবাদ থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের জহরৎ কিনে আনলেন। একছড়া মুক্তোর মালা, একখানি কল্কা, একটা শিরপেঁচ ও চারটে আংটী—দুটি হীরের, দুটি মাণিক্যের।

জহরৎগুলো দেখে ক্ষেমঙ্করী ত' বেজায় খুসী। বললেন: এ পরলে রূপসী প্রমদাকে সত্যিই মানাবে। দামটা একটু বেশী। তা হোক গে। এর চাইতে কম দামের জহরৎ আমরা দেব কেন?

স্বামীর সামাজিক প্রতিপত্তি ও খ্যাতির কথা বিবেচনা করেই ক্ষেমঙ্করী ও-কথা বললেন। কিন্তু প্রমদাকে এত দামী যৌতুক

দেওয়ার পেছনে নন্দকুমারের আর একটা উদ্দেশ্য ছিল। জহরৎ যেমন মেয়েদের অঙ্গভূষণ, তেমনি মূলধনও বটে। বিপদে আপদে তারা এর উপর নির্ভর করতে পারে। জহরৎগুলো প্রমদার চিরস্থায়ী সম্পত্তি হয়ে থাকবে।

জহরতের ছোট বাক্সটা হাতে নিয়ে নন্দকুমার যখন বাসুদেব শাস্ত্রীর বাড়ীর সামনে পাল্কী থেকে নামলেন, গোধূলির ছায়া নামছে পথে। নন্দকুমার জহরৎগুলো আবার দেখে নিলেন। প্রমদার মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলবে এই জহরৎ! গয়নাগাটি—জহরতের প্রতি লোভ, মেয়েদের আজন্ম সংস্কার। মেয়েরা শিক্ষিত হোক আর অশিক্ষিত হোক, জহরতের প্রতি সকলেরই সমান পক্ষপাতিত্ব। প্রমদার হাসিমুখ কল্পনা করে নন্দকুমার আনন্দিত হন।

পাল্কীর বাহকদের বাইরে অপেক্ষা করতে বলে নন্দকুমার বাঁশের দরজা ঠেলে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে থমকে দাঁড়ালেন। কদিন আগে তিনি যখন এসেছিলেন, প্রাঙ্গণে তখন মরশুমি ফুলের কি বাহার! আজ কিন্তু একটা ফুলও নেই। বাড়ীটা নিঝ্‌ঝুম নিস্তব্ধ। তবে কি প্রমদা চলে গেল? কিন্তু এত শীগগির ত' শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার কথা ছিল না তার!

নন্দকুমার ডাকলেন ঃ প্রমদা! প্রমদা!

সাড়াশব্দ নেই। বাড়ীটা কেমন যেন থমথমে।

প্রমদা! প্রমদা! আশ্চর্য্য! বাড়ীতে কি সত্যিই কেউ নেই! গেল কোথায় সব!

ঘরের ভেতর ও কে,—প্রমদা শুয়ে আছে নাকি ? নন্দকুমার দাওয়ায় উঠলেন।

তোমার বিয়ের যৌতুক এনেছি প্রমদা ! কোথায় তুমি !

আস্তে আস্তে প্রমদা দরজার পাশে এসে দাঁড়াল। শুভ্র বসন পরিহিতা প্রমদার চোখে মুখে অকালবৈধব্যের ম্লানছায়া।

এক মুহূর্ত্ত নন্দকুমার বিমূঢ় দৃষ্টিতে প্রমদার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কাটতে না কাটতেই ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন নন্দকুমার। তোমাকে সালঙ্কারা দেখব বলে আমি যে বড় সাধ করে জহরৎ নিয়ে এসেছি, প্রমদা ! না না···এ বেশে তোমাকে আমি দেখতে পারব না ! এ কি করলে ভগবান ! কেন এ ফুলটিকে অকালে শুকিয়ে দিলে !

একখানি বলিষ্ঠ হাত নন্দকুমারের কাঁধ স্পর্শ করল। নন্দকুমার ভক্তিভরে গুরুদেবকে প্রণাম করলেন।

তারপর আস্তে আস্তে বললেনঃ অপরাধ নেবেন না গুরুদেব ! আপনি জ্যোতিষশাস্ত্রে এতবড় পণ্ডিত হয়েও, নিজের একমাত্র মেয়ের বিয়েতে এ ভুল কেমন করে করলেন ?

নন্দকুমারের অভিযোগ শুনে প্রমদা আস্তে আস্তে ঘরের ভেতর চলে গেল। বাসুদেব এক মুহূর্ত্ত চুপ করে রইলেন। নন্দকুমার বলতে লাগলেনঃ আমি জ্যোতিষশাস্ত্রে আপনার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করি নি। কিন্তু কেন, কেন আপনি বিয়ের আগে ভাল করে কোষ্ঠী বিচার করলেন না ?

বাসুদেব ঃ বিচলিত হয়ো না বৎস! বস।

বাসুদেব আসন পরিগ্রহ করলে নন্দকুমার তাঁর পায়ের কাছে একখানি কুশাসনে বসে পড়লেন। বাসুদেব বলতে লাগলেন ঃ সেদিন যখন জামাই-এর মৃত্যু সংবাদ এল, তোমার মত আমিও বড় বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। নিজেকে কতবার দোষারোপ করেছি!···কিন্তু নন্দকুমার জ্যোতিষী কি তাঁর নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন? পারেন না। সবই নিয়তি।

নন্দকুমার ঃ আপনি মহাজ্ঞানী মহাজন। আপনার প্রতি সন্দেহ আরোপ করে আমি অপরাধ করেছি। নিজগুণে ক্ষমা করবেন।

বাসুদেব স্মিত হেসে নন্দকুমারের পিঠে হাত রাখলেন। তাঁর দৃষ্টি পড়ল ছোট্ট বাক্সটির উপর। কি আছে ওতে? প্রশ্ন করলেন বাসুদেব ঃ জহরৎ?

নন্দকুমার ঃ হাঁ।

সহসা বাসুদেব উত্তেজিত স্বরে বললেন ঃ না না, ও জিনিষ এখানে নয়; এসব জহরৎ তুমি এখুনি নিয়ে চলে যাও।

নন্দকুমার বাসুদেবের ভাবান্তর লক্ষ্য করে বললেন ঃ গুরুদেব, আপনার মানসিক অবস্থার কথা আমি সব বুঝতে পারছি।

কিন্তু জহরৎ ক'খানি প্রমদার নামেই কেনা। এগুলো আমি কিছুতেই ফিরিয়ে নিতে পারব না।

বাসুদেব বললেন ঃ বেশ, তাহলে এগুলো পুকুরের জলে ফেলে দাও।

নন্দকুমার ঃ এ কি বলছেন, গুরুদেব !

বাসুদেব ঃ নন্দকুমার, কথা শোন। আমার চেয়ে বেশী হিতাকাঙ্ক্ষী দুনিয়ায় বোধ করি তোমার কেউ নেই। বেশ, ওগুলো ত্যাগ করতে যদি মায়া হয়, বাড়ী নিয়ে গিয়ে সিন্দুকের ভেতর বন্ধ করে রাখ

নন্দকুমার ঃ কিন্তু গুরুদেব !

বাসুদেব ঃ তাহলে তুমি সব কথা আমার মুখ দিয়ে বের না করে শান্ত হবে না ! বেশ, তবে শোন—এটা হয়ত তোমার পক্ষে ভগবানেরই আশীর্ব্বাদ যে প্রমদা বিধবা হয়েছে।

বাজ পড়লে নন্দকুমার এতখানি চমকাতেন না। বললেন ঃ এ আপনি কি বলছেন, গুরুদেব ?

বাসুদেব ঃ আরো বলছি শোন। তোমার ও প্রমদার দুইজনেরই জন্ম-পত্রিকা আমি বিচার করেছি। প্রমদার পক্ষ থেকে তোমার মস্ত বড় কোন ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। অপমান, অপযশ…চাই কি তার চেয়েও বেশী কিছু। অপমৃত্যু…হ্যাঁ, তাও হতে পারে। সেই জন্য বলছি, প্রমদার সঙ্গে তুমি ভবিষ্যতে কোন সম্পর্ক রাখবে না।

নন্দকুমার ঃ আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। কিন্তু এই জহরৎ …এ ত' আমি ফিরিয়ে নিতে পারব না।

বাসুদেব ঃ আবার সেই জহরৎ। বেশ, ঘরে নিয়ে যেতে না চাও, বাজারে বেচে দিয়ো।

নন্দকুমার ঃ বেচে যা পাব, প্রমদাকে পাঠিয়ে দেব।

বাসুদেব ঃ না। তার দরকার হবে না। প্রমদার শ্বশুর-বাড়ীর অবস্থা অসচ্ছল নয়। বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছেই প্রমদা থাকবে। অর্থ সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই। অবশ্য, পরে যদি আবশ্যক হয়···জানি না, কিন্তু এখন ওকে টাকা-পয়সা পাঠিয়ো না।

নন্দকুমার ঃ তাই হবে, গুরুদেব।

বাসুদেব—হ্যাঁ, কি বলছিলাম···ছাখো নন্দকুমার, শীগগির আমি বদরিকাশ্রমের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি।

নন্দকুমার ঃ বদরিকাশ্রম! সে যে অনেক দূরের পথ!

বাসুদেব ঃ হাঁ। যদি ফিরতে না পারি, তোমাদের সঙ্গে এই শেষ দেখা।

নন্দকুমার ঃ গুরুদেব, আপনি চলে গেলে কার কাছে আমি উপদেশ নিতে যাব?

বাসুদেব ঃ কেন, উপদেশ নেবে তুমি তোমার বিবেকের কাছে। ভগবানে রাখবে ভরসা। কিন্তু একটা কথা জেনে রেখ নন্দকুমার, নিয়তি কেউ রোধ করতে পারে না।

বাংলা বিহার উড়িষ্যার রাজধানী মহানগরী মুর্শিদাবাদ তখন প্রাচ্যের অন্যতম বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। ভারতের নানাপ্রদেশ থেকে এখানে বণিকেরা আসতেন ব্যবসা করতে।

হরেকরকম বেসাতি ছিল তাঁদের। সুদী-লগ্নি ছিল তাঁদের প্রাচীন ব্যবসায়। কেননা সুদী কারবারের মত লাভজনক ব্যবসায় খুব কমই আছে। নবাব, আমীর ওমরাহ থেকে সুরু করে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সকলেই তাঁদের কাছ থেকে টাকা ধার নিতেন। এমনি একজন বণিক ছিলেন শেঠ বুলাকীদাস। মস্ত বড় গদী তাঁর রাজধানীতে। নানা কাজ কারবার। সুদী-লগ্নি ত' আছেই। তা ছাড়া, চুনি-পান্না হীরা-জহরতেরও কারবার তিনি করতেন। শেঠ বুলাকীদাসের সঙ্গে নন্দকুমারের পরিচয় ছিল। তাই জহরৎগুলো বিক্রী করবার জন্য তিনি বুলাকীদাসের গদীতে গেলেন।

নন্দকুমার পদস্থ ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ। শেঠ বুলাকীদাস তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। সব কথা শুনে বুলাকী-দাস বললেনঃ এর জন্য কষ্ট করে আপনার আসার কি প্রয়োজন ছিল—আমাকে ডেকে পাঠালেই যেতাম! তারপর জহরৎগুলো বেশ করে পরীক্ষা করে বললেনঃ তা জিনিষগুলো খাঁটী। এর দাম প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা হবে বৈ কী!

নন্দকুমারঃ আমার কেনা দামটা পেলেই খুসী হব।

বুলাকীদাসঃ তা পাবেন। কিন্তু প্রভু, বাজার বড় মন্দা। হীরা-জহরতের খরিদ্দার আজকাল কালে-ভদ্রে আসে।

নন্দকুমারঃ দেশের রাজনৈতিক আকাশ ঘন ঘটাচ্ছন্ন। চারদিকে বিদ্রোহ, উত্তেজনা, অশান্তি। এ অবস্থায় বাজার পড়বে বই কি!

বুলাকীদাস ঃ আপনার কি মনে হয় যে…

নন্দকুমার ঃ ও সব কথা এখন থাক শেঠজী। হ্যাঁ, তাহলে জহরৎগুলোর কি হবে ?

বুলাকীদাস ঃ জিনিষগুলো আপনি যদি কেনাদামেই বেচতে চান, আপনাকে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে প্রভু। তেমন খরিদ্দার না পেলে আমি আপনার জহরৎ বিক্রী করব না।

নন্দকুমার ঃ সে ত' খুব ভাল কথা। তাহলে জহরৎগুলো আপনার কাছেই গচ্ছিত থাক। বিক্রী করে আপনার সুদী কারবারে খাটাবেন—যতক্ষণ না আমি ফেরৎ নিতে আসি।

বুলাকীদাস ঃ নিশ্চয়ই খাটবে। ভাল আয় হবে আপনার। টাকা প্রতি চার আনা সুদ পাবেন। নন্দকুমার উঠে দাঁড়ালেন, বললেন ঃ তাহলে ঐ কথা রইল। আজ তাহলে আসি।

বুলাকীদাস দরজা অবধি তাঁকে এগিয়ে দিতে এলেন। বললেন ঃ আচ্ছা প্রভু, নবাব দরবারে বর্ত্তমান অবস্থায় টাকা ধার দেওয়া কি উচিত হবে ?

নন্দকুমার ঃ না। কেন না, সে টাকা ফেরত পাওয়া না পাওয়া ঈশ্বর ভরসা।

বুলাকীদাস ঃ কিন্তু নবাব যদি জোর-জবরদস্তি করেন ?

নন্দকুমার ঃ তা করবেন বলে মনে হয় না। জাফর আলির মেরুদণ্ড অত শক্ত নয়।

ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌

নন্দকুমার যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে তহশীল-দারের পদ গ্রহণ করেন, ঐ সময় ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারে রেসিডেণ্ট্‌ পদে নিযুক্ত হন। বাস্তবিক হেষ্টিংসের কর্ম্ম-জীবন ঘটনাবহুল ও বৈচিত্র্যময়। কোম্পানীর দপ্তরে সাধারণ কেরানীর কাজ লইয়া তিনি ভারতে আসেন।

পলাশী যুদ্ধের আগে হেষ্টিংস্‌ মুর্শিদাবাদে বন্দী হন। অবশেষে ওলন্দাজ কুঠির বড় সাহেবের জামিনে তিনি মুক্তি-লাভ করেন। সেখানে হেষ্টিংস্‌ গুপ্তচরের কাজ করতেন। নবাব যখন জানতে পারলেন, দরবারের সমস্ত সংবাদ হেষ্টিংস্‌ গোপনে ইংরাজদের নিকট পাঠান, তাঁর ক্রোধের সীমা রইল না। হেষ্টিংস্‌ তখন প্রাণভয়ে পালিয়ে ফলতায় ইংরাজ শিবিরে যান। সেখানে তিনি 'ভলাণ্টিয়ার' সৈন্যশ্রেণী-ভুক্ত হন।

পলাশী যুদ্ধ জয়ের পর, ক্লাইব নবাব দরবারে একজন স্ব-জাতীয় পোষণ করবেন স্থির করেন। তিনি ভাল করেই জানেন, নবাব মীরজাফর তাঁর বিরুদ্ধাচরণে অসমর্থ। দেওয়ান রায়দুর্লভ তাঁর আপন লোক। নবাবের চেয়ে কোম্পানীর স্বার্থটাই তিনি বেশী দেখেন। তবু ক্লাইব সন্তুষ্ট হতে

পারেন নি। তিনি এদেশীয় লোকদের বিশ্বাস করতেন না; তাই দরবারে কি হচ্ছে না হচ্ছে সঠিক খবর রাখবার জন্য রেসিডেন্টের পদে ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌কে নিযুক্ত করলেন।

নন্দকুমার তখন কোম্পানীর তহশীলদার। সে যুগে জমিদারেরা প্রতি বছরই নানা ছল-ছুতো করে রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করতেন। কিন্তু নন্দকুমারের কাছে তাঁদের কোন ছল-ছুতোই টিঁকল না। কোম্পানীর রাজস্ব আদায় করবার জন্য তিনি দৃঢ়সংকল্প।

হুগলী, বর্দ্ধমান ও নদীয়ার জমিদারেরা তখন রেসিডেন্ট্ হেষ্টিংস্ সাহেবের শরণ নিলেন। রাজস্ব মকুব ও নন্দকুমারের হাত থেকে রেহাই পাবার আশায় তাঁরা প্রচুর উপঢৌকন পাঠাতে লাগলেন হেষ্টিংস্‌কে। হেষ্টিংসের বেশ দু'পয়সা উপরি রোজগার হতে লাগল। তিনি নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ক্লাইবকে লিখলেন। কিন্তু ক্লাইব তাঁর কথায় কান দিলেন না।

সেদিন নন্দকুমার দপ্তরে বসে কাজ করছেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ এসে হাজির।

তুমি এখানে? নন্দকুমার প্রশ্ন করলেন। হেষ্টিংস্ বললেন: নন্‌কুমার! হাপনার নামে নালিশ আছে। দেশের মানী জমিদারেরা হাপনার অত্যাচারে জর্জ্জরিত।

নন্দকুমার: তাই নাকি? তারপর?

হেষ্টিংস্: তাহারা হামার protection চাহিয়াছে। ভবিষ্যতে হাপনি তাহাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিবেন।

নন্দকুমার ঃ বটে ? আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি। তোমার প্রলাপ শুনবার মত আমার সময় নেই।

হেষ্টিংস্ ঃ হাপনি আমাকে insult করিতে সাহস করেন ?

ঘরে ঢুকলেন ক্লাইব। হেষ্টিংস্ তাঁকে দেখে একেবারে ভেজা বেড়ালটী বনে গেলেন।

ক্লাইব ঃ হেষ্টিংস্ এখানে কেন ?

নন্দকুমার ঃ উনি জমিদারদের পক্ষ থেকে ওকালতি করতে এসেছেন।

ক্লাইব ঃ মিঃ হেষ্টিংস্! আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ভবিষ্যতে রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যাপারে মাথা ঘামাইতে চেষ্টা করিয়ো না। Now get out of the office, get out I say !

ওয়ারেন হেষ্টিংস্ বেরিয়ে গেলে ক্লাইব বললেন ঃ ঘুষ খেতে অসুবিধা হইতেছে হেষ্টিংসের !

নন্দকুমার আস্তে আস্তে বললেন ঃ কর্ণেল সাহেব, আমার একটা নিবেদন আছে।

ক্লাইব ঃ বলুন।

নন্দকুমার ঃ আমি আর কাজ করব না।

ক্লাইব ঃ হঠাৎ কাজ ছাড়িয়া দিতে চান কেন ?

নন্দকুমার ঃ তাতে আপনাদের অসুবিধে হবে না। এ বছরের রাজস্ব আদায়ের কাজ ত প্রায় শেষ হল। এখন কিছুদিন আমি বিশ্রাম গ্রহণ করব।

পারেন নি। তিনি এদেশীয় লোকদের বিশ্বাস করতেন না; তাই দরবারে কি হচ্ছে না হচ্ছে সঠিক খবর রাখবার জন্য রেসিডেন্টের পদে ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌কে নিযুক্ত করলেন।

নন্দকুমার তখন কোম্পানীর তহশীলদার। সে যুগে জমিদারেরা প্রতি বছরই নানা ছল-ছুতো করে রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করতেন। কিন্তু নন্দকুমারের কাছে তাঁদের কোন ছল-ছুতোই টিঁকল না। কোম্পানীর রাজস্ব আদায় করবার জন্য তিনি দৃঢ়সংকল্প।

হুগলী, বর্দ্ধমান ও নদীয়ার জমিদারেরা তখন রেসিডেন্ট্ হেষ্টিংস্ সাহেবের শরণ নিলেন। রাজস্ব মকুব ও নন্দকুমারের হাত থেকে রেহাই পাবার আশায় তাঁরা প্রচুর উপঢৌকন পাঠাতে লাগলেন হেষ্টিংস্‌কে। হেষ্টিংসের বেশ দু'পয়সা উপরি রোজগার হতে লাগল। তিনি নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ক্লাইবকে লিখলেন। কিন্তু ক্লাইব তাঁর কথায় কান দিলেন না।

সেদিন নন্দকুমার দপ্তরে বসে কাজ করছেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ এসে হাজির।

তুমি এখানে? নন্দকুমার প্রশ্ন করলেন। হেষ্টিংস্ বললেনঃ নন্‌কুমার! হাপনার নামে নালিশ আছে। দেশের মানী জমিদারেরা হাপনার অত্যাচারে জর্জ্জরিত।

নন্দকুমারঃ তাই নাকি? তারপর?

হেষ্টিংস্ঃ তাহারা হামার protection চাহিয়াছে। ভবিষ্যতে হাপনি তাহাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিবেন।

নন্দকুমার ঃ বটে ? আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি। তোমার প্রলাপ শুনবার মত আমার সময় নেই।

হেষ্টিংস্ ঃ হাপনি আমাকে insult করিতে সাহস করেন ?

ঘরে ঢুকলেন ক্লাইব। হেষ্টিংস্ তাঁকে দেখে একেবারে ভেজা বেড়ালটী বনে গেলেন।

ক্লাইব ঃ হেষ্টিংস্ এখানে কেন ?

নন্দকুমার ঃ উনি জমিদারদের পক্ষ থেকে ওকালতি করতে এসেছেন।

ক্লাইব ঃ মিঃ হেষ্টিংস্! আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ভবিষ্যতে রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যাপারে মাথা ঘামাইতে চেষ্টা করিয়ো না। **Now get out of the office, get out I say !**

ওয়ারেন হেষ্টিংস্ বেরিয়ে গেলে ক্লাইব বললেন ঃ ঘুষ খেতে অসুবিধা হইতেছে হেষ্টিংসের !

নন্দকুমার আস্তে আস্তে বললেন ঃ কর্ণেল সাহেব, আমার একটা নিবেদন আছে।

ক্লাইব ঃ বলুন।

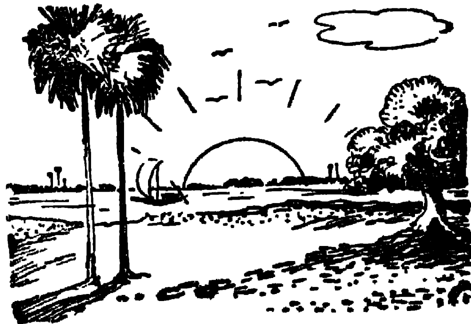
নন্দকুমার ঃ আমি আর কাজ করব না।

ক্লাইব ঃ হঠাৎ কাজ ছাড়িয়া দিতে চান কেন ?

নন্দকুমার ঃ তাতে আপনাদের অসুবিধে হবে না। এ বছরের রাজস্ব আদায়ের কাজ ত প্রায় শেষ হল। এখন কিছুদিন আমি বিশ্রাম গ্রহণ করব।

ক্লাইব ঃ হাপনার যেমন ইচ্ছা। কিন্তু হাপনার জন্য সব সময় দরজা খোলা রহিল। যখনই কাজে যোগ দিতে চান হামাকে জানাইবেন।

ধন্যবাদ, কর্ণেল সাহেব। নন্দকুমার ইংরাজ দরবারের সংস্পর্শ ত্যাগ করলেন।



দরবারে

হুঁসিয়ার! হুঁসিয়ার! নবাব সুজাউল্ মুল্ক্, হাসামদ্দৌলা মীর মহম্মদ জাফর আলি খাঁ মহবৎ জঙ্গ বাহাদুর! নকীব ঘোষণা করল। দেওয়ান, আমীর, ওমরাহ, পাত্র-মিত্র ও সভাসদেরা সসম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ করে। বৃদ্ধ নবাব ক্লাইবকে সঙ্গে নিয়ে দরবারে প্রবেশ করে, তক্ত মোবারকে আসন পরিগ্রহ করলেন। তাঁর দক্ষিণ দিকে একখানি কুর্সীতে বসলেন ক্লাইব। বাঁদিকে বসলেন দেওয়ানের কুর্সীতে রায়-দুর্লভ। অনতিদূরে শেঠদের আসনে শ্রেষ্ঠী জগৎশেঠ মহাতাব চাঁদ, শ্রেষ্ঠী স্বরূপচাঁদ, রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতি উপবিষ্ট। দুপাশে সেনাধ্যক্ষ, আমীর ওমরাহ, পাত্রমিত্র সভাসদেরা। একটুখানি তফাতে দর্শন-প্রার্থীরা।

জগৎশেঠ উঠে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ করে বললেনঃ হজরৎ! আমার একটা অভিযোগ আছে।

নবাবঃ শ্রেষ্ঠী জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ বাহাদুর! বলুন, আপনার কি অভিযোগ।

জগৎশেঠঃ জাঁহাপনা! শেঠেরা চিরকাল নবাব সরকারের জন্য টাকা তৈরী করে এসেছে। পুরুষানুক্রমিক টাঁকশালের ব্যবসা আমাদের। কলকাতায় ইংরাজদের টাঁকশাল বসাবার অনুমতি দিয়ে নবাব আমাদের ব্যবসা থেকে বঞ্চিত করেছেন। এই কি ন্যায় বিচার?

জগৎশেঠের অভিযোগে ক্লাইবের চোখমুখের ভাব শক্ত হয়ে

উঠল। নবাব বারেক ক্লাইবের দিকে তাকিয়ে উদাস স্বরে বললেন ঃ শেঠেদের টাঁকশালের ব্যবসা পুরুষানুক্রমিক। বটেই ত। কিন্তু জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ বাহাদুর! কর্ণেল সাহেব অনুরোধ করলেন, তাই কলকাতায় টাঁকশাল বসাবার অনুমতি দিলাম কোম্পানীকে। তা কর্ণেল সাহেব যেমন আমার দোস্ত, তেমনি আপনারও ত দোস্ত। কর্ণেল সাহেবের মুখ চেয়ে না হয়, এটুকু ক্ষতি স্বীকার করলেন!

জগৎশেঠ ক্ষুন্নমনে বললেন ঃ হুজরতের আদেশ শিরোধার্য্য। আমি আমার অভিযোগ তুলে নিলাম।

রায়দুর্লভ অনুচ্চস্বরে নবাবকে বললেন ঃ লক্ষ্ণৌএর সরাপ ব্যবসায়ী খোজা বাজীদের প্রতিনিধি হুজরতের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

নবাব ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। রায়দুর্লভ ইঙ্গিত করতেই খোজা বাজীদের প্রতিনিধি মহম্মদখান কুর্ণিশ করে নবাবের সামনে এগিয়ে এসে বলল ঃ জাঁহাপনা! তিনপুরুষ ধরে আমরা নবাব সরকারের জন্য সরাপ তৈরী করছি। আমাদের সমাজের শত শত লোকের ঐ জীবিকা। এখন ইংরাজ ফিরিঙ্গিকে সরাপ ব্যবসার একচেটে মঞ্জুরী দিয়ে আমাদের ডালরুটি কেড়ে নেবেন না হুজুর!

মীরজাফর বিরক্তস্বরে বললেন ঃ সাহেবরা তোমাদের চেয়ে ঢের ভাল সরাপ তৈরী করেন। ওঁরা জাত-সরাপী। তাই সরাপ তৈয়ারের একচেটে অধিকার ওঁদেরই দিলাম।

মহম্মদখান মিনতিমাখা স্বরে বলল ঃ জাঁহাপনা! মালেক! দয়া করুন! সরাপ তৈরীর ব্যবসা থেকে আমাদের একেবারে বঞ্চিত করবেন না।

মীরজাফর ক্রুদ্ধস্বরে বললেন ঃ দেওয়ান সাহেব! এসব অর্থহীন অভিযোগ ভবিষ্যতে আমি আর শুনতে চাইনে।

দুজন সিপাই মহম্মদখানকে দরবার-গৃহ থেকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল।

রায়দুর্লভ কুর্ণিশ করে বললেন ঃ জাঁহাপনা ঠিকই বলেছেন। এর চেয়ে ঢের ঢের জরুরী কাজ রয়েছে আমাদের হাতে।

মীরজাফর ঃ সেই সব জরুরী কর্ত্তব্যগুলো এবার বিবেচনা করা যাক।

রায়দুর্লভ ক্লাইবের দিকে তাকাতেই, তিনি চোখের ইসারায় কি বললেন। রায়দুর্লভ একখানি দলিল নবাবের সামনে মেলে ধরলেন।

নবাব ঃ কি ওটা?

উত্তর দিলেন ক্লাইব। বললেন ঃ A notice! হামি লিখিয়াছে—হাপনাকে সহি করিতে হইবে।

নবাব ঃ আবার সই করতে হবে? কিসের ইস্তাহার ওটা?

রায়দুর্লভ ঃ জমিদারের উদ্দেশ্যে লিখিত ইস্তাহার।

মীরজাফরের মুখ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। বিরক্তি গোপন করে তিনি বললেন ঃ জমিদারী সংক্রান্ত সনদে আমি ত সেদিন সই করে দিয়েছি। বর্দ্ধমান, নদীয়া ও হুগলীর জমিদার এখন

কোম্পানী বাহাদুর। এ বছরও তাঁরা রাজস্ব আদায় করবেন।

ক্লাইব: Your Excellency! This is a very important notice. ইহাতে হুজরতকে সহি করিতে হইবে। বিশেষ জরুরী।

দরবার-গৃহে ক্লাইবের মুখে এই ধরণের কথা শুনে পাত্র-মিত্রদের সামনে নবাব অপমানিত বোধ করেন। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের অসহায় অবস্থার কথা মনে পড়ে যায়। পলাশীর পর থেকে গৃহশত্রু বিভীষণে রাজধানী ছেয়ে গেছে। এমন কি, নবাবের দক্ষিণ হস্ত দেওয়ান রায়দুর্লভও তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কাকে তিনি বিশ্বাস করবেন? এ-অবস্থায় ইংরাজের সঙ্গে কোন্ ভরসায় তিনি কলহ করবেন! সিরাজের পরিণতির কথা ভেবে নবাব ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেন। ইংরাজের দাবীগুলো বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিতে হয় মীরজাফরকে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা, গোরাসৈন্যের ব্যয় বহন, এমন কি হুগলী, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরের রাজস্ব আদায়ের হুকুমনামা পর্য্যন্ত কোম্পানীকে লিখে দিলেন। তবু কি ক্লাইব তাঁকে রেহাই দিচ্ছেন?

রায়দুর্লভ কুর্ণিশ করে বললেন: হুজরৎ! ইস্তাহারে সই না করলে মহা অনর্থ ঘটবে। হুগলীর জমিদারেরা এমনিতেই ত বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। ওদের সায়েস্তা করা প্রয়োজন।

মীরজাফর নিঃশ্বাস মোচন করে বললেন: তাই নাকি

দেওয়ান সাহেব? তা হলে ত আমাকে অবশ্যই সই করতে হবে। কাগজখানি আপনি পড়ুন দেখি একবার।

রায়দুর্লভ পড়তে লাগলেন:

"এতদ্দারা হুগলীর ভূম্যধিকারিবর্গকে জানান যাইতেছে যে, তোমরা অদ্য হইতে কোম্পানীর প্রত্যক্ষ শাসনাধীন হইলে। তাহারা ভালমন্দ যেরূপ আচরণ করুক না কেন, তোমরা বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাই স্বীকার করিয়া লইবে। ইহাই আমার বিশেষ রাজাজ্ঞা।"

কম্পিত হস্তে নবাব উক্ত হুকুমনামায় সই করলেন।



তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন: চমৎকার পরামর্শ দিচ্ছ সাহেব! তার চেয়ে সোজা কথায় বললেই পার, নবাবী গদী ছেড়ে সরে দাঁড়াও এবার। আমরা বসি তক্তে!

ক্লাইব বিরক্তস্বরে বললেন: নবাবজাদা! হাপনি কি বলিতে চাহে I can't understand.

মীরজাফর: আঃ তুমি থাম মীরণ। কর্ণেল সাহেব আমার দোস্ত, তিনি কি কখনো আমাকে কুপরামর্শ দিতে পারেন?

ক্লাইব: Exactly, Your Excellency! হামি আপনার আছে দোস্ত, হাপনি আমার উপদেশ শ্রবণ করিবে। মঙ্গল হইবে।

রায়দুর্লভ সায় দিয়ে বললেন: কর্ণেল সাহেব ভাল কথা বলেছেন। বিবেচনা করে দেখুন জাঁহাপনা, গোরাবাহিনী যার সহায় তার কোন ভয় নেই। তা ছাড়া, সৈন্যবাহিনী ভেঙ্গে দিলে অতগুলো টাকা আপনার বেঁচে যাবে।

মীরজাফর: সে কথা ঠিক। গোরাবাহিনী যখন আমার সহায় তখন আর কিসের ভয়!

মীরণ: জাঁহাপনা! পূর্ণিয়া শত্রুসঙ্কুল। বিহার বিদ্রোহোন্মুখ। বন্ধুর ছদ্মবেশে গুপ্তঘাতক রাজধানীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ অবস্থায় সৈন্যবাহিনী ভেঙ্গে দেওয়া কি উচিত হবে মালেক?

ক্লাইব: Your Excellency! হামিলোগ বিদ্রোহ দমন করিবে।

ছুটে এল দূত। কুর্ণিশ করে বললে: জাঁহাপনা! শাজাদা শীগ্‌গিরই বঙ্গভূমি আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

ইংরাজের চিরশত্রু শাজাদা। চমকে উঠলেন ক্লাইবঃ **What! Shazada invading Bengal!**

মীরজাফর ভীত স্বরে বলেনঃ কি হবে সাহেব?

ক্লাইবঃ হামিলোগ শাজাদার সঙ্গে লড়াই করিবে।

রায়দুর্লভঃ গোস্তাকি মাপ করবেন হুজরৎ! কর্ণেল-সাহেব সন্তুষ্ট থাকলে, আমাদের কোন ভয় নেই।

মেদিনীপুর, পূর্ণিয়া, ঢাকা সর্ব্বত্র—বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠছে। ক্লাইবের গর্দ্দভ মীরজাফরকে নবাব বলে স্বীকার করতে চাইছে না তারা। এমন কি অনেক ক্ষুদে জমিদারেরাও নবাবের রাজস্ব দিতে অস্বীকার করছেন।

এদিকে পাটনার শাসন-কর্ত্তা রাম-নারায়ণ অযোধ্যাপতি সুজাদৌল্লার সাহায্যে মীরজাফর সহ ইংরাজ শক্তিকে দেশ থেকে বিতাড়িত করবার জন্য রণ-সজ্জায় ব্যস্ত।

চারিদিকে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। নবাব মীরজাফরের চোখে ঘুম নেই। কাঁটার মুকুটে মাথা তাঁর ক্ষত-বিক্ষত। কিন্তু বাইরের শত্রুদের চেয়ে গৃহশত্রু বিভীষণদের তাঁর বেশী ভয়।

হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। নবাবের মনে হয় রাজধানীর ঘরে ঘরে বুঝি তাঁর বিরুদ্ধে এক বিরাট ষড়যন্ত্র চলেছে। যেমন করে তিনি ও তাঁর সহকর্ম্মীরা নবাব সিরাজদৌল্লার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। তক্ত মোবারক তারা কেড়ে নিতে চায়।

মীরজাফরের স্থির ধারণা, রায়দুর্লভ ঐ ষড়যন্ত্রের নেতা। হ্যাঁ, মীরজাফরকে হত্যা করে দেওয়ান রায়দুর্লভ তক্ত মোবারকে বসতে চায়।

মীরণ অভয় দিয়ে বলেন, হুকুম করুন হজরৎ, দেওয়ান রায়দুর্লভকে আজ রাতেই হত্যা করি।

—না মীরণ, মীরজাফর বলেন : ও কাজ করো না। ক্লাইব সাহেব রেগে গিয়ে শেষকালে আমাকে কি শাস্তি দেবেন কে জানে!

—সাহেব! সাহেব! সাহেব! ব্যবসা-বাণিজ্য গেল, মণিমুক্তা ধনরত্ন হীরা-জহরৎ গেল—গেল রাজকোষ। এখন সৈন্যবাহিনীও যেতে বসেছে। হজরৎ কি আজও একথা বুঝতে পারছেন না, ক্লাইবের কথা শুনলে তক্ত মোবারকও একদিন হাতছাড়া হয়ে যাবে?

মীরজাফর : সবই বুঝি মীরণ। সবই জানি। কিন্তু উপায় নেই। মাকড়সার জালের ভেতর দিয়ে দিনের পর দিন আমি জড়িয়ে পড়ছি।

মীরণ : মাকড়সার জাল থেকে চেষ্টা করলে হয়ত এখনো বেরিয়ে আসা যায়। কিন্তু কদিন বাদে আর তাও সম্ভব হবে না।

মীরজাফর : কেমন করে?

মীরণ : জাঁহাপনা! আসুন, আমরা ওলন্দাজ বণিকদের সাহায্য নিয়ে ইংরাজকে এদেশ থেকে দূর করি।

মীরজাফর ভীতচকিত দৃষ্টিতে চারিদিকে বারেক তাকিয়ে বললেনঃ চুপ চুপ! কেউ শুনতে পাবে। ঐ রায়দুর্লভ নবাব দরবারের সব গোপন খবর ইংরাজ ফিরিঙ্গির কানে পৌঁছে দিচ্ছে।

মীরণঃ সেইজন্যই ত বলছি, অনুমতি দিন মালেক! রায়দুর্লভকে খতম করি।

মীরজাফরঃ না না মীরণ, আর হত্যাকাণ্ড নয়। ঢের হয়েছে।

হাওয়ার আগে কথা উড়ে। খবরটা রায়দুর্লভের কানে যেতেই প্রাণভয়ে তিনি শয্যা নিলেন। কে না জানে, খুনখারাপির কাজে মীরণ অদ্বিতীয়! অসুস্থতার ভাণ করে রায়দুর্লভ ঘরের বাইরে কদিন পা দিলেন না। এদিকে তাঁর দূত ছুটল ক্লাইবের কাছে। নবাব ওলন্দাজ বণিকদের সাহায্য নিয়ে ইংরাজের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করতে চান; সংবাদ পেয়ে ক্লাইব ক্ষেপে গেলেন। পদাশ্রিত নবাব জাফর আলির এতখানি দুঃসাহস! তিনি ভাল করেই জানতেন, তাঁর উপস্থিতি মীরজাফরের মনে ভয়ের সঞ্চার করবে। তাই অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে সেইদিনই ক্লাইব মুর্শিদাবাদ যাত্রা করলেন।

হলও তাই। প্রাণভয়ে ভীত মীরজাফর নতুন করে নজরানা দিয়ে ক্লাইবকে সন্তুষ্ট করলেন।

ক্লাইবের উপস্থিতির সুযোগে রায়দুর্লভ রাতারাতি সুস্থ

হয়ে উঠে নতুন উদ্যমে নবাবের সর্ব্বনাশ সাধনের উপায় খুঁজতে লাগলেন। মীরজাফর রায়দুর্লভের বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস পান না।

ইংরাজ দরবারে—বিশেষ করে ক্লাইবের কাছে তখন নন্দকুমারের অশেষ প্রতিপত্তি। সময়ে অসময়ে নানা বিষয় পরামর্শ গ্রহণ করবার জন্য ক্লাইব নন্দকুমারের নিকট যাতায়াত করেন। জনসাধারণ ও গোরাবাহিনীর নিকট তিনি 'কালা কর্ণেল' নামে অভিহিত। নবাব এ-কথা জানতেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা নবাব মীরজাফর ছদ্মবেশে নন্দকুমারের বাড়ীতে গেলেন। নন্দকুমার সৌজন্য প্রকাশ করে তাঁকে বসতে দিলেন। কিন্তু নবাব বসলেন না। ইসারায় তিনি নন্দকুমারকে শিবিকার ভেতর ডেকে নিলেন। বাহকেরা শিবিকা কাঁধে তুলে চলতে শুরু করল।

নবাব বললেন ঃ নন্দকুমারজী! চোরের মত লুকিয়ে এসেছি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। পাছে কেউ আমাকে চিনতে পারে তাই আপনাকে শিবিকার ভেতর ডেকে নিলাম।

নন্দকুমার ঃ বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব আজ কার ভয়ে ভীত হজরৎ ?

মীরজাফর ঃ নন্দকুমারজী! বাংলা বিহার উড়িষ্যার স্বাধীনতা পলাশীর প্রান্তরে চির অস্তমিত। আজ আর নবাবের কোন স্বাধীনতা নেই। চারিদিকে অবিশ্বাস ষড়-

মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি—



রায়দুর্লভ বললেন—হজরত, রাজকোষ অর্থশূন্য। পৃষ্ঠা—৪২

যন্ত্র···। ষড়যন্ত্র করে যারা সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করেছিল, আজ তারা আমারই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সেদিনকার ষড়যন্ত্রের নায়ক ছিলাম আমি, আর আজকার ষড়যন্ত্রের নায়ক আমার এককালীন দোস্ত ও সহকর্ম্মী রায়দুর্লভ।

নন্দকুমার: এ কি কথা হজরৎ! রায়দুর্লভ! আপনার দেওয়ান ?

মীরজাফর: আমি যেমন নবাব সিরাজদ্দৌল্লার সিপাহ্-শালার ছিলাম!

নন্দকুমার: আত্মবিশ্বাস হারাবেন না মালেক! নবাব ষড়যন্ত্রকারীদের ভয়ে ভীত ? কিসের ভয়, কাকে ভয়! প্রয়োজন হলে ইংরাজের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করবেন, এই প্রতিজ্ঞা করুন হজরৎ!

মীরজাফর: ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা! এ-কি বলছেন আপনি ? না না, সে রকম কোন মতলবই আমার নেই। আমি এসেছিলাম, কর্ণেল সাহেবকে বলে যদি আপনি রায়দুর্লভকে দেওয়ানী পদ থেকে বরখাস্ত করেন।

নন্দকুমার: আমায় ক্ষমা করুন জাঁহাপনা। এ-সব কাজে আমি মাথা গলাতে চাইনে। তা ছাড়া কোম্পানীর চাকরীও আমি ছেড়ে দিয়েছি।

মীরজাফর: তা জানি। কিন্তু ক্লাইব আপনাকে শ্রদ্ধা করেন। আপনার পরামর্শ গ্রহণ করবার জন্য তিনি উৎসুক।

নন্দকুমার : ক্ষমা করবেন। এ বিষয় ক্লাইভ সাহেবকে আমি কোন পরামর্শ দিতে চাইনে।

মীরজাফর : নন্দকুমারজী ! আমি আপনাকে একলক্ষ টাকা দেব ! জায়গীর দেব ! রায়দুর্লভকে পদচ্যুত করুন।

নন্দকুমার : জাঁহাপনা ! এ সব কাজে কেন আমাকে টানতে চাইছেন ? কেন ভুলে যাচ্ছেন মালেক, পলাশীর ষড়যন্ত্রে আমি আপনাদের দলভুক্ত ছিলাম না।

শিবিকা থামিয়ে পথে নেমে এলেন নন্দকুমার। ক্রোধে, অপমানে মীরজাফরের মুখে কথা সরে না এক মুহূর্ত্ত। অবশেষে বাহকদের ধমক দিয়ে বললেন : জোরসে চল্।



মীরকাশেম

কিন্তু রায়দুর্লভকে তক্ত-মোবারকের প্রতিদ্বন্দ্বী সন্দেহ করে নবাব ভুল করেছিলেন। আকাশের কোণে কালমেঘ সঞ্চিত হচ্ছে। কালবৈশাখীর ঝড় উঠতে আর বিলম্ব নেই। বৃদ্ধ নবাব সবই আঁচ করেছিলেন। কিন্তু বিপদ্ কোন্ দিক থেকে আসছে ঠাহর করতে পারেন নি।

জামাতা কাশেম আলি নবাবের সৈন্য বিভাগের একজন দক্ষ সেনানায়ক। পলাশীর যুদ্ধে মীরকাশেম শ্বশুরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সিরাজের সঙ্গে বেইমানি করেছিলেন। কাশেম আলির হৃদয়ে সিংহাসন-স্পৃহা জেগে উঠতে পারে, নবাব মীরজাফর কল্পনাও করেন নি। শেঠেদের তুলনায়, রায়-দুর্লভের তুলনায় কাশেম আলি ক্ষুদ্র নগণ্য ব্যক্তি।

সেই কাশেম আলিই কিন্তু নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে লাগলেন। সিরাজ-মহিষী লুৎফুন্নেসার হীরে-জহরৎ, মণিমুক্তো লুঠ করে তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন। এবার তাঁর দৃষ্টি পড়ল তক্তের প্রতি। যে নিয়মে সিপাহশালার মীরজাফর সিরাজদ্দৌল্লাকে সরিয়ে বাংলা বিহার উড়িষ্যার মসনদে বসলেন, ঠিক সেই নিয়মে মীরকাশেমই বা কেন মীরজাফরকে সরিয়ে তক্তে বসবেন না।

মীরজাফরের নবাবী প্রাপ্তির পর থেকে মীরকাশেম তাঁর

প্রতিটা পদক্ষেপ লক্ষ্য করছিলেন। নবাব মীরজাফরের না আছে ব্যক্তিত্ব, না আছে সাহস। ক্লাইবের ইঙ্গিতে তিনি পুতুলের মত উঠা-বসা করেন। দিনের পর দিন ক্লাইবের ফাঁদে তিনি এমনিভাবে জড়িয়ে পড়ছেন যে মীরকাশেমের ভয় হয়, শেষ পর্য্যন্ত তক্ত-মোবারকের কোন অস্তিত্বই থাকবে না। নবাবের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে জনসাধারণের উপর ইংরাজের অত্যাচার বেড়েই চলেছে। নবাব কোম্পানীর প্রতি অহেতুক পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য তাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। শেঠেরা তাই নবাবের উপর অসন্তুষ্ট। মীরজাফরের রাজত্বে সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা, হাহাকার। রাজকোষ অর্থহীন। শেঠেরা নবাব সরকারে যে টাকা ধার দিয়েছিলেন সে-টাকাও যে আর কোনদিন ফেরত পাবেন, তার কোন সম্ভাবনাই আর নেই। দেউলে নবাবের প্রতি শেঠেদের সহানুভূতি না থাকাই স্বাভাবিক। মীরকাশেম শেঠেদের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করলেন।

এ খবর বেগম ফতেমা ছাড়া আর কেউ জানত না। মীরজাফর-দুহিতা ফতেমা মীরকাশেমের প্রধান মহিষী। স্বামীর উচ্চাকাঙ্ক্ষার খবর তিনি রাখতেন। ইংরাজের ফাঁদে বার বার আত্মসমর্পণ করে মীরজাফর আপন দুহিতারও সহানুভূতি হারিয়েছিলেন। তাছাড়া আরও একটা কারণে পিতার উপর তিনি বিরূপ ছিলেন। বিমাতা মণিবেগমকে তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না। অথচ মীরজাফর মণিবেগমকেই

সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। তাই স্বামীর উচ্চাকাঙ্ক্ষায় বেগম ফতেমা খুসীই হয়েছিলেন।

সেদিনকার গোপন বৈঠকে শেঠেরা ছাড়াও ইংরাজ বাহিনীর অধ্যক্ষ মেজর কেল্ড্ উপস্থিত ছিলেন। কেল্ড্ কলকাতার কাউন্সিলে চিঠি লিখলেন, শেঠেরা সবাই কাশেম আলির পক্ষে। কাশেম আলি তক্তে বসলে, দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। ফলে ইংরাজ তাদের পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় নবাব থেকে আদায় করতে পারবেন।

নবাব মীরজাফর ইংরাজদের খুসী করবার জন্য যতই আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন, তা' ততই বিগড়ে যাচ্ছিল। প্রয়োজন টাকার—তোষামোদে কি বণিকেরা তুষ্ট হয়? কিন্তু মীরজাফরের অবস্থা এমন এক স্তরে এসে পৌঁচেছে যে, কোম্পানীকে তিনি আর কিছুই দিতে অক্ষম। তাই কাশেম আলির প্রস্তাবে কাউন্সিলারেরা অন্ধকারে আশার আলো দেখতে পান।

মেজর কেল্ড্ চিঠিতে লিখলেন: কাশেম আলি কাউন্সি-লারদের মোটা টাকা ঘুষ দিতে রাজী আছেন। ঘুষের প্রস্তাবে হলওয়েল, ভ্যান্সিটার্ট প্রমুখ কাউন্সিলারদের জিভে জল এসে পড়ল। কতদিন তাঁরা উপরি রোজগার করেন নি।

সেদিন ফোর্ট উইলিয়ামে কলকাতা কাউন্সিলের অধিবেশনে শেঠেরা আমন্ত্রিত হয়ে যোগ দিতে এলেন। পদাশ্রিত নবাব

মীরজাফরকে তক্ত-মোবারক থেকে নামিয়ে আনা উচিত হবে কিনা এ নিয়ে কিছুক্ষণ বাগ-বিতণ্ডা চলল।

ভূতপূর্ব্ব রেসিডেন্ট, ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ কাউন্সিলার। তিনি বললেন: We need money to carry on a business. আলি যদি নবাবী চান, হামাদের টাকা অবশ্যই মিটাইয়া দিবেন।

রায়দুর্লভ: অতি আশা করো না হেষ্টিংস্ সাহেব! রাজ-কর্ম্মচারীদের মাইনে যে নবাব দিতে পারেন না, তিনি তোমাদের পাওনা শোধ করবেন!

জগৎশেঠ: নবাব জাফর আলি দেউলে। রাজ্যের সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা। অর্থাভাবে সেনাদল ভেঙ্গে পড়েছে। এ অবস্থায় শা-জাদা যদি বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন, তখন যুদ্ধ একা তোমাদেরই করতে হবে সাহেব!

ভ্যান্সিটার্ট: হাপনি ঠিক বাত বলিয়াছে। হামিলোগ এমন একজন নবাব চাই যে শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিবে। দেশে শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিবে। হামিলোক বাণিজ্য করিয়া দু' পয়সা লাভ করিতে পারিবে।

হলওয়েল: Right you are. কাশেম আলি able সেনানায়ক। তাহার শাসনে দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিবে।

একজন কাউন্সিলার বললেন: জাফর আলি যে ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়া আছেন, এর পর কি অজুহাতে তোমরা তাহাকে গদীচ্যুত করিবে?

হলওয়েল : অযোগ্যতার অজুহাতে। আমি জানি আমাদের আদেশ অমান্য করিয়া বিদ্রোহ করিবার ক্ষমতা জাফর আলির নাই।

জগৎশেঠ : কাশেম আলি নবাব জাফর আলির সমস্ত ঋণ শোধ করবেন। তা ছাড়া আপনাদের মোটা টাকা ঘুষও দেবেন।

এ সময় ইংরাজের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। অর্থাভাবে সৈন্যবাহিনীর বেতন দেওয়া হয় নি। কোম্পানীর যা আয়, ব্যয় প্রায় তার আড়াইগুণ।

বণিকবৃত্তির কাছে ধর্ম্মবুদ্ধি চিরকালই হার মেনেছে। শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বসম্মতিক্রমে কাশেম আলিকে নবাবী দেওয়াই স্থির হল! বাইবেল ও কোরাণ-শরিফ স্পর্শ করে যে চুক্তিপত্র সই করা হয়েছিল, কোম্পানী তার সম্মান রাখলে না। তিন বছর চার মাস যেতে না যেতেই নবাব জাফর আলি গদীচ্যুত হলেন।

ইংরাজের অন্যতম পণ্যদ্রব্য বাংলা বিহার উড়িষ্যার মসনদ কাসেম আলি চড়া দামে কিনে নিলেন।



মীরণ

নবাব মীরজাফর কিন্তু তখনো কিছুই জানেন না। কলকাতায় ফোর্ট-উইলিয়াম মন্ত্রণাকক্ষে যখন এত সব কাণ্ড হচ্ছে, রাজধানীর নিভৃত কক্ষে নবাব তখন মৌতাত করছিলেন। কখনো বা নর্ত্তকীরা নৃত্যগীতে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নবাবকে উৎফুল্ল করবার চেষ্টা করছে। কখনো বা মণিবেগম তাঁকে বাণ বাজিয়ে শোনাচ্ছেন।

ক্লাইব যখন যা চেয়েছেন, সাধ্যমত নবাব তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন নি। কোম্পানী আর যাই করুক, তাঁকে সহসা গদীচ্যুত করবে, মীরজাফর একথা ভাবেন নি।

নবাবপুত্র মীরণ কিন্তু ইংরাজকে আদৌ বিশ্বাস করতেন না। নবাবকে তিনি ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবার জন্য বার বার উত্তেজিত করতেন।

মীরজাফর বলতেন: ইংরাজ দুর্দ্ধর্ষ জাতি। ওদের সঙ্গে যুদ্ধে কেউ পেরে উঠবে না। মীরণ! আমি বৃদ্ধ হয়েছি। আর ক'দিনই বা আছি! আমার অবর্ত্তমানে তুমিই বসবে তক্তে। তোমার ভবিষ্যৎ ভেবেই আমি ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাই না।

মুর্শিদাবাদের ভাবী নবাব মারণকে কিন্তু রাজধানীতে সবাই ঘৃণা ও ভীতির চোখে দেখত। রাজধানীর বহু লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের নায়ক ছিলেন এই মীরণ।

পুত্রস্নেহে অন্ধ নবাব মীরণের বিরুদ্ধে কোন কথাই কানে তুলতেন না। তা ছাড়া এসব হত্যাকাণ্ডে অনেক সময় নবাব মীরজাফরের যোগাযোগ থাকত।

মীরজাফর যখন তক্তে বসলেন, আলীবর্দ্দী খাঁ ও সিরাজ-দৌল্লার পরিবারবর্গ বন্দীদশা ভোগ করছিলেন। দেওয়ান রায়দুর্লভ সিরাজদ্দৌল্লার পনের বছর বয়স্ক ভাই মীর্জ্জা মেহদীকে কারাগার থেকে মুক্ত করবার জন্য নবাবের নিকট আবেদন করেন। মীরজাফর আশঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তবে কি রায়দুর্লভ মীর্জ্জা মেহদীকে সিংহাসনে বসাতে চান?

পাছে মীর্জ্জা মেহদীকে নিয়ে রাজধানীতে মীরজাফরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সুরু হয়, তাই নবাব আগে থেকেই সাবধানতা অবলম্বন করলেন। মীর্জ্জা মেহদীকে কারাগারের ভেতর হত্যা করবার জন্য মীরজাফর মীরণকে আদেশ দিলেন।

এর আগে মীরণের আদেশেই নবাব সিরাজদ্দৌল্লাকে জাফরগঞ্জ প্রাসাদে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়।

মীরজাফরের আদেশে সেই রাত্রেই মীরণ বিচিত্র উপায়ে মীর্জ্জা মেহদীর জীবন নাশ করলেন। নির্জ্জন কারাকক্ষে পনের বছরের কিশোরের দুপাশে দুখানি তক্তা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে, চাপ দিয়ে মীর্জ্জা মেহদীকে হত্যা করা হল।

এরপর সিরাজদ্দোলার মাতা আমিনা বেগম ও মাসী ঘসেটী বেগমের পালা। মীরণ এঁদেরও হত্যা করলেন। কিন্তু আরো বিচিত্র আরো নিষ্ঠুর উপায়ে। অশেষ যন্ত্রণা

দিয়ে পদ্মাগর্ভে এঁদের ডুবিয়ে মারা হয়। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আমিনা ও ঘসেটী অভিশাপ দিলেন: হে আল্লা! তুমি এর বিচার কর! তোমার বজ্র যেন অত্যাচারীর মাথায় ভেঙ্গে পড়ে।

সত্যিই, ঘসেটী ও আমিনার অভিশাপের হাত থেকে মীরণ রেহাই পেলেন না। সেদিন নবাবজাদা মীরণ পার্শ্বচরদের নিয়ে রাজমহলের পথে অশ্বারোহণে ছুটে চলেছেন। পার্শ্বচরদের পেছনে রেখে তাঁর অশ্ব তীরবেগে ছুটেছে। সহসা দিগন্ত আঁধার করে আকাশের কোণে কালমেঘ সঞ্চিত হতে লাগল। আকাশের অবস্থা লক্ষ্য করে মীরণ আতঙ্কিত হয়ে উঠেন। একপাশে উত্তাল তরঙ্গময়ী পদ্মা, অন্য পাশে ধূ ধূ প্রান্তর। নবাবজাদা আশ্রয়ের সন্ধানে আরো জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। এদিকে আকাশে ঘন ঘন মেঘ ডাকছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। দূরে কোথায় যেন বাজ পড়ল। আঁতকে উঠলেন মীরণ। মৃত্যুপথযাত্রী ঘসেটী ও আমিনার মুখ তাঁর মানস-পটে ভেসে উঠল। 'হে খোদা! তুমি এর বিচার কর। তোমার বজ্র অত্যাচারীর মাথায় ভেঙ্গে পড়ুক।' পাশেই হাত কয়েক দূরে বাজ পড়ল। বাজ পড়ার শব্দে ক্ষিপ্ত হয়ে অশ্ব তার আরোহীকে ফেলে দিয়ে উল্কার বেগে ছুটতে লাগল। উপায়ান্তর না দেখে মীরণ দৌড়াতে লাগলেন। কিন্তু কোথায় তিনি যাবেন? সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে অবিরাম বাজ পড়তে লাগল। দুহাতে দুকান চেপে ধরে দিশেহারা মীরণ

ছুটতে লাগলেন ঃ কে আছ বাঁচাও ! বাঁচাও ! বাঁচাও ! প্রাণপণে চীৎকার করেন মীরণ। কিন্তু বাজের শব্দে তিনি তাঁর নিজের গলাও শুনতে পান না। আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। ধূ ধূ প্রান্তরে কে তাঁকে বাঁচাতে আসবে? বেগমদের শেষ প্রার্থনা খোদা শুনতে পেয়েছেন।

—বাঁচাও ! বাঁচাও ! বাঁচাও !

এত সব হত্যানুষ্ঠানের নায়ক, যাঁর ভয়ে রাজধানীর সবাই তটস্থ, তাঁকে অভয় দেবার জন্য, আশ্রয় দেবার জন্য আজ আশেপাশে একটা প্রাণীও নেই !



সিরাজের অভিশাপ

রাজধানী মুর্শিদাবাদের আর একটি রাত এল, তার হাসি-গান রূপরং-এর অপূর্ব্ব বর্ণচ্ছটা নিয়ে। নিত্যকার মত আজো আমীর ওমরাহ ও সেনাধ্যক্ষরা বিলাসতরঙ্গে গা ঢেলে দিলেন! এদের হাবভাব দেখে কে বলতে পারে, নবাব মীরজাফরের সর্ব্বনাশ সাধনের যে ব্যবস্থা হয়েছে, এরা তার খবর রাখে! হ্যাঁ, শুধু খবর রাখাই নয়, এরা তার সঙ্গে যোগাযোগও রেখেছে!

কোম্পানীর সঙ্গে পাকাপাকি ব্যবস্থা করে নিয়ে মীরকাশেম আমীর ওমরাহ, সেনাধ্যক্ষ ও নাগরিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন—দলে টেনেছিলেন তাদের অনেককেই। মুর্শিদাবাদের নাগরিকেরা জানে, নবাব জাফর আলির আজই শেষ রজনী।

শুধু নবাব নিজের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কোন খোঁজ খবর রাখেন না। আজো তাই নবাবের অন্তঃপুরে হাজারবাতি জ্বলে উঠেছে। বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত নর্ত্তকীরা নবাবের মনো-রঞ্জনের প্রয়াস পাচ্ছে।

কিন্তু নবাবের আজ মন ভাল নেই। মণিবেগমের ইঙ্গিতে নর্ত্তকীরা পাশের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। নবাব নিঃশ্বাস মোচন করে বললেন: মণিবেগম! মীরণের কোন সংবাদ এল?

মণিবেগম : না হুজরৎ !

নবাব : মীরণের জন্য মন কেমন করছে মণিবেগম ! আজ ত' তার ফিরে আসার কথা ছিল। কি জানি কেন সে এল না।

মণিবেগম : মিথ্যেই ব্যস্ত হচ্ছেন জাঁহাপনা ! নবাবজাদা হয়ত কোন কারণে আজ ফিরতে পারেন নি। কাল অবশ্যই ফিরবেন।

মীরজাফর : তাই হবে ! তাই হবে ! বিশেষ কোন কাজে হয়ত সে আটকে গেছে। কাল নিশ্চয়ই ফিরবে।

নবাব জানালায় তাকিয়ে বললেন : বাইরে কি বৃষ্টি পড়ছে মণিবেগম ?

মণিবেগম : হ্যাঁ হুজরৎ ! গোস্তাকি মাফ করবেন মালেক, রাজধানীতে একটা গুজব উঠেছে।

—গুজব ?

—জাঁহাপনা ! গুজব এই যে কাশেম আলি নাকি নবাবী তক্তের জন্য আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত !

মীরজাফর ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। পরক্ষণেই তিনি হেসে উঠলেন : দামাদ্ কাশেম আলি নবাবী তক্ত চায় ! হা হা হা !

মণিবেগম : হুজরৎ ! কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবার নয়। শেঠেরা নাকি কাশেম আলির পক্ষে।

মীরজাফর : হুঁ। আর ফতেমা ? ফতেমাও নিশ্চয় সেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ? কই, তার কথা ত' কিছু বলছ না মণিবেগম !

মণিবেগম : হুজরৎ ! বেগম ফতেমার সঙ্গে আমার ব্যক্তি-

গত শত্রুতা রয়েছে, জাঁহাপনা কি ভাবছেন এইজন্যে আমি কাশেম আলির নামে গুজব রটনা করছি।

মীরজাফর: মণিবেগম! কেন ভাবছ! যতদিন ইংরাজ আমাদের পক্ষে থাকবে, কেউ কিছু করতে পারবে না! কাশেম আলি ত' নগণ্য ব্যক্তি।

মণিবেগম: সেই জন্যই ত' আমি এসব গুজবে কান দিচ্ছি না হজরৎ!

সহসা ভীষণ শব্দ করে বাইরে কোথায় বাজ পড়ল। চমকে উঠলেন নবাব। পরিচারিকারা যে যেখানে ছিল চীৎকার করে উঠল। আলুথালু বেশে বব্বু বেগম ছুটে এলেন।

হজরৎ! মালেক! অশ্রুজড়িত স্বরে তিনি বললেন: নবাবজাদা মীরণ আর বেঁচে নেই। রাজমহলের পথে বজ্রাঘাতে ওর মৃত্যু হয়েছে।

এক মুহূর্ত্ত মীরজাফর বব্বু বেগমের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকেন। আস্তে আস্তে তাঁর বোধশক্তি ফিরে আসে। নবাবের ঠোঁট কাঁপছে। চোখের কোণে অশ্রু।

মীরণ! অশ্রুজড়িত স্বরে নবাব বললেন: আমার আশা, আমার শেষ বয়সের অবলম্বন! মীরণকে কেড়ে নিলে খোদা!

মণিবেগম সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: বিচলিত হবেন না হজরৎ!

খোদা! কেন, কেন আমাকে এতবড় শাস্তি দিলে!...... পুত্রশোকে কাতর বৃদ্ধ নবাব ঝরঝর করে কাঁদতে সুরু করলেন।

মণিবেগমের মনে পড়ে যায় আমিনা বেগমের কথা। নবাব সিরাজদ্দৌল্লার মা আমিনাও এমনি ধারা রাজধানীর রাস্তায় সিরাজের খণ্ডিত দেহ বুকে জড়িয়ে কেঁদে আকুল হয়েছিলেন। চমকে উঠেন মণিবেগম।

ক্লান্ত শোকার্ত্ত নবাব পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন। মণিবেগম পাশে বসে।

রাত বাড়ছে। রাজপুরী নিঃশব্দ। তন্দ্রাচ্ছন্ন মণিবেগমের ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাইরে ও কিসের গোলমাল? হল্লা ক্রমেই বাড়ছে। মণিবেগম নবাবের দিকে তাকালেন। নবাব নিদ্রিত। আস্তে আস্তে তিনি জানালার পর্দ্দা তুলে বাইরে তাকালেন। অন্তঃপুরের এই জানালা দিয়ে দরবার-গৃহের ভেতরের অংশের খানিকটা নজর পড়ে। সেখানে অনেক লোকজন। সবাই কথা বলছে। এতরাতে এরা সব এখানে কি করছে! তবে কি গুজব যা রটেছে, তার সবই সত্যি?

মণিবেগম আর সেখানে দাঁড়ালেন না—আসল ব্যাপারটা কি জানবার জন্য দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

হল্লা শুনে নবাবের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি চোখ মেলে তাকালেন। বললেন: বাইরে ও কিসের গোলমাল মণিবেগম?

উত্তর না পেয়ে নবাব পাশ ফিরলেন। মণিবেগম ঘরে নেই। আস্তে আস্তে তিনি উঠে বসলেন। মুকুট মাথায় পরে জানালায় এগিয়ে গেলেন।

দরবার-গৃহে তখন আমীর ওমরাহ ও শ্রেষ্ঠীরা এসে জড়

ত্যাগ করলেন। দিশেহারা নবাব কোন্ দিকে পালাবেন কিছুই স্থির করতে পারেন না।

—কে, কে ওখানে ?···আর্ত্তস্বরে বলেন নবাব।

মীর্জ্জা সামসের সামনে এসে দাঁড়াল।

—জাঁহাপনা! মালেক! এখনো রাজমুকুট আপনার শিরে! হুকুম করুন জনাব! বিদ্রোহী কাশেম আলিকে বন্দী করি।

—মীরজাফরের চোখে কৃতজ্ঞতার অশ্রু। আস্তে আস্তে বলেন : দোস্ত! একদিন আপনি আমায় ক্লাইবের গর্দ্দভ বলে বিদ্রূপ করেছিলেন। সেদিন আপনার বিদ্রূপের তাৎপর্য্য বুঝতে পারিনি, কিন্তু আজ বুঝতে পেরেছি সত্যিই আমি গর্দ্দভের মত কাজ করেছি।···আজ যদি মীরণ বেঁচে থাকত! সে আমায় ইংরাজ সম্বন্ধে বারবার সাবধান করেছিল! কিন্তু আমি তার কথায় কোন দিন কান দিইনি!

মীর্জ্জা সামসের : আমার সৈন্যেরা হজরতের হুকুমের অপেক্ষা করছে।

মীরজাফর : সে হয় না মীর্জ্জা সামসের! আমি বৃদ্ধ, অশক্ত, পুত্রশোকে কাতর। ইংরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস আমার নেই।

মীর্জ্জা সামসের : কিন্তু মালেক—

মীরজাফর : আমি পাপী, মহাপাপী! মীরণকে কেড়ে নিয়ে, তক্ত কেড়ে নিয়ে খোদা পাপীকে শাস্তি দিয়েছেন। বিদায় বন্ধু!

মীর্জ্জা সামসের কুর্ণিশ করে বিদায় গ্রহণ করলেন।

মীরজাফর নিঃশ্বাস-মোচন করেন। পলাশীর কথা মনে পড়ে যায়। নতজানু হয়ে নবাব সিরাজদ্দৌল্লা তাঁর অনুকম্পা ভিক্ষা করেছিলেন। এমন করুণ আবেদনে পাষাণও গলে যায়। কিন্তু সিপাহ্‌শালার জাফর আলির হৃদয় সেদিন পাষাণের চেয়েও কঠিন। কোরাণ শরীফ স্পর্শ করে মীরজাফর যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনি কি তা রক্ষা করেছেন ?

বিশ্বাসঘাতক! বেইমান! কে যেন তাঁর কাণের কাছে গর্জ্জে ওঠে। তক্তের লোভে সেদিন তুমি এতবড় বেইমানিটা কেমন করে করলে ? বিশ্বাসঘাতক! বেইমান! আজ তার শোধ দেবার সময় হয়ে এসেছে।

মীরজাফর ঘামতে লাগলেন ভয়ে। না, না···তক্ত মোবারক আমার চাইনে···কিছুই আমার চাইনে···সিরাজের পরিণতির কথা যতই তাঁর মনে পড়ে, ততই ভয়ে প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে আসে।

না, না···নবাবী আমার চাইনে···রাজমুকুট আমার চাইনে··· জীবনের বাকী ক'টা দিন আমাকে শান্তিতে বাঁচতে দাও! বিড়বিড় করে নবাব আপনমনে বলতে লাগলেন: আমায় মেরো না···প্রাণে মেরো না···রাজধানী ত্যাগ করে এক্ষুনি আমি অনেক দূরে চলে যাচ্ছি।···অনেক দূরে···আমায় শুধু বাঁচতে দাও।

সিরাজের কথা মনে পড়ে। সিরাজও ত বাঁচতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মীরজাফর ত তাঁকে বাঁচতে দেননি! রাজমহলের

পথ থেকে ধরে এনে, ঘাতকের হাতে সমর্পণ করেছিলেন সিরাজকে। আজ কাশেম আলিই বা কেন মীরজাফরকে ঘাতকের হাতে দেবেন না ?

পালাও…পালাও…যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, ওরা এসে পড়বার আগে প্রাণ নিয়ে পলায়ন কর। এখানে আর এক মুহূর্ত্তও থাকা নিরাপদ নয়। সবাই পালিয়েছে তোমাকে একা ফেলে, সবাই পালিয়েছে, কিসের অপেক্ষায় আছ তুমি ?

কিন্তু কোন্‌দিকে পা বাড়াবেন মীরজাফর ঠিক করতে পারেন না। বাইরে পদশব্দ উঠলেই ভয়ে তাঁর প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে আসে। ঐ বুঝি কাশেম আলির চর আসছে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে! কে, কে ওখানে! মীরজাফর আর্ত্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠেন। বারান্দা দিয়ে ছায়ামূর্ত্তি ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে।

কে তুমি! কথা কও! উত্তর দাও! ঘাতক ?…কে তুমি!

না, না…আমায় হত্যা কর না, আমায় হত্যা কর না। তক্ত মোবারক আমার চাইনে। রাজমুকুট আমি খুলে রেখেছি। আমায় বাঁচতে দাও…আমায় বাঁচতে দাও!

মণিবেগম নবাবের এ অবস্থা দেখে দরজায় থমকে দাঁড়ান। এত দুঃখেও কাপুরুষ মীরজাফরের কাণ্ড দেখে তাঁর হাসি পায়।

হজরৎ! মালেক! মণিবেগম বলেন: গোস্তাকি মাফ করবেন জাঁহাপনা! বারান্দায় ছায়া দেখে জনাব ঘাতক বলে ভুল করছেন।

—মণিবেগম! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন নবাব। কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ মণিবেগম? আমি ভাবলাম, শেষ পর্য্যন্ত তুমিও বুঝি আমায় ত্যাগ করলে!

—ওসব কথা থাক হজরৎ! মণিবেগম বললেন: আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকা নিরাপদ নয়।

মীরজাফর: কিন্তু যাব কোন চুলোয়? যেখানেই যাই, কাশেম আলির গুপ্তচর আমাদের ঠিক ধরে আনবে।

মণিবেগম: হজরৎ! আত্মসমর্পণ করলেই কি মীরকাশেম আপনাকে রেহাই দেবেন, ভেবেছেন? আর, আত্মসমর্পণ যদি করতেই হয়, কাশেম আলির কাছে নয়, হজরৎ তাদের কাছেই আত্মসমর্পণ করবেন, যারা কাশেম আলিকে তক্তে বসিয়েছে।

মীরজাফর: তুমি ঠিকই বলেছ মণিবেগম! আমি ইংরাজের কাছেই আত্মসমর্পণ করব। একমাত্র ওঁরাই আমাকে মীর কাশেমের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন।

কিন্তু মীরজাফরকে ইংরাজ-সেনাধ্যক্ষের নিকট যেতে হল না। মেজর কেল্ড্ নিজেই এলেন। বললেন: Your Excellency! কোম্পানীর হুকুমে হামি আপনাকে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতা পৌঁছাইয়া দিবে। হাপনার ধন-প্রাণ যাহাতে বিপন্ন না হয়, তাহা দেখিবে।

মীরজাফর স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

নবাবী করব, গোলামী নয়

হুঁসিয়ার! হুঁসিয়ার! নবাব নাসির উল্ মুল্ক্ ইমতিয়াজ-দ্দৌলা মীর মহম্মদ কাশেম আলি খাঁ মহবৎ জঙ্গ বাহাদুর!

নকীব ঘোষণা করে। আমীর ওমরাহ পাত্রমিত্র সবাই স-সম্মানে উঠে দাঁড়ান। ধীর পদক্ষেপে দরবার-কক্ষে প্রবেশ করে নবাব তক্তে বসেন। আমীর ওমরাহ কুর্ণিশ করে নিজেদের আসনে বসেন। তিন বছর আগে সেদিন এরাই দরবার-কক্ষে মীরজাফরকে নবাব বলে অভিনন্দিত করেছিল। জাফর আলির পরিণতি নিয়ে আজ আর কেউ মাথা ঘামায় না। নতুন নবাবকে অভিনন্দিত করতে সবাই আজো এসেছে—মীরজাফর সম্বন্ধে কারো বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। দু'দিন বাদে হয়ত আবার নতুন নবাব আসবেন (কে বলতে পারে!), তখনো এরা তাঁকে অভিনন্দন জানাতে আসবে। স্নেহ, প্রেম, প্রীতি ও শ্রদ্ধা—রাজনীতিতে এদের স্থান নেই।

মীরকাশেম: শ্রেষ্ঠী জগৎ শেঠ মহতাব চাঁদ! শ্রেষ্ঠী স্বরূপ চাঁদ! রাজা রাজবল্লভ! রাজা রায় দুর্লভ! আপনাদের চেষ্টায় আমি নবাবী পেয়েছি। ভবিষ্যতেও যেন আপনাদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত না হই। যে স্বপ্ন ও আশা নিয়ে আমি তক্তে বসেছি, কেবল মাত্র আপনাদের সাহায্যেই তা সফল হতে পারে।

জগৎ শেঠ: হজরৎ! আমরা ত নিমিত্তমাত্র! ইংরাজরাই হজরতকে তক্তে বসিয়েছে। ওদের সাহায্যেই জাঁহাপনার স্বপ্ন সফল হবে।

মীরকাশেম নিজের ভুল বুঝতে পারেন। শেঠেরা তাঁর আবেদনে সাড়া দিতে নারাজ! মেজর কেল্‌ড্‌ উঠে দাঁড়িয়ে বলতে সুরু করেন: Your Excellency!···My friends! হামি কিছু বলিতে চাহে। নবাব জাফরআলি খাঁর অক্ষম শাসনে দেশের সর্ব্বত্র অরাজকতা সুরু হইয়াছে। হামিলোগ তাই His Excellency কাসেম আলিকে নবাবী দিল। কোম্পানী নবাবের শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে না। হামি আশা করে, নতুন নবাব কোম্পানীর সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করিবেন। জাফর আলির যতই দোষ থাকুক না কেন, এদিক থেকে তিনি আদর্শ নবাব ছিলেন। কোম্পানীর পরামর্শ মত তিনি কাজ করিতেন। নবাব কাশেম আলি আশা করি, জাফর আলির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন।

মীরকাশেম: না সাহেব, তা হবে না। নবাব কাশেম আলি নবাবীই করবে, ইংরাজের গোলামি করবে না।

সভাগৃহে একমুহূর্ত্ত কারো মুখে কথা নেই। প্রথম দিনেই দরবার-কক্ষে বসে মীরকাশেম এত বড় ঘোষণা করবেন কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। শেঠেরা বিরক্ত। মেজর কেল্‌ড্‌ বিস্মিত, বিমূঢ়। নবাব সহসা উঠে দাঁড়ালেন বললেন: আজকের মত দরবার শেষ হল।

নবাব মীর কাশেমের আজ অভিষেক-উৎসব। সন্ধ্যা হতে না হতেই রাজপুরীতে হাজার বাতি জ্বলে উঠেছে। নাগরিকেরা ঝকঝকে পোষাকে সজ্জিত হয়ে উৎসবে যোগ দিতে এসেছেন।

মীরকাশেম তখন মন্ত্রণাঘরে বসে বিশ্বস্ত অনুচরদের সঙ্গে ভাবী কর্ম্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। বাইরে থেকে হট্টগোল ভেসে আসছে। নবাব জিজ্ঞাসা করলেন: ও কিসের হট্টগোল তকী খাঁ?

—জাঁহাপনার আজ অভিষেক রজনী, তাই রাজপুরীতে আনন্দোৎসব সুরু হয়েছে।

মীরকাশেম কি ভেবে বললেন: চল, একবার দেখে আসি ঘুরে।

প্রাঙ্গণে বেজায় ভীড়। একদল নর্ত্তক-নর্ত্তকী নৃত্যগীতে সমাগত নাগরিকদের মনোরঞ্জন করছে। নৃত্যের তালে তালে নাগরিকদের কেউ দুলছে, কেউ সিটী দিচ্ছে, কেউ বা নাচতে সুরু করেছে কোমর বাঁকিয়ে। কেউ বা বেসামাল হয়ে লাফাচ্ছে। কখন নবাব এসে তাদের ভেতর দাঁড়িয়েছেন কেউ লক্ষ্য করেনি।

—বন্ধ কর এ নাচ-গান! চেঁচিয়ে উঠলেন নবাব। ভোজবাজীর মত পলকে সব নিথর হয়ে গেল। নর্ত্তক-নর্ত্তকী, সমাগত জনতা কারো মুখে কথা নেই। নবাব কি পাগল হয়ে গেলেন? আজ, তাঁর অভিষেক-রজনীতে কোথায় আমাদের বকৃশিস দেবেন, না, একি রুদ্রমূর্ত্তি নবাবের?

এগিয়ে এল একজন। কুর্ণিশ করে বললেঃ জাঁহাপনা! গোস্তাকি মাফ কিজিয়ে। আজ আমাদের বড় খুসীর দিন, বড় আনন্দের দিন। তাই—

মীরকাশেম স্মিতমুখে বললেনঃ জানি ইয়াকুব! কিন্তু আমোদ-প্রমোদ ও বিলাস-তরঙ্গের স্রোতে গা ঢেলে নষ্ট করবার মত এক মুহূর্ত্ত সময় নেই আমাদের হাতে। রাজপুরী থেকে নর্ত্তক-নর্ত্তকীদের বিদায় কর। বিদায় কর সেই সব দাস-দাসী ও চাটুকারের দল—যারা এখানে অবাঞ্ছিত, অনাবশ্যক।

—জাঁহাপনা!

—হ্যাঁ, রাজপুরীতে আমি কাজের লোক ছাড়া অন্য কাউকে দেখতে চাইনে। চাই কাজ। আত্মসুখ ও ভোগ-বিলাসের জন্য কাশেম আলি মসনদে বসেনি বন্ধু! এস, আজকের দিনে আমরা প্রতিজ্ঞা করি—ইংরাজের নাগপাশ ছিন্ন করে বাংলা বিহার উড়িষ্যার স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনব!

বিস্মিত জনতা মীরকাশেমের দিকে তাকিয়ে থাকে। নবাব মীরকাশেম কি ইংরাজের সঙ্গে লড়াই করতে চান?



অবাধ বাণিজ্য

নবাব মীরজাফরের রাজত্বে জলে-স্থলে কোম্পানীর অবাধ বাণিজ্য দেশের ছোট বড় সব ব্যবসাই ক্রমে ক্রমে গ্রাস করল। এমন কি পান, সুপারী, লবঙ্গ ও তামাকের ব্যবসাও তারা বাদ দিলে না। দেশের লোকের হাতে আর কোন ব্যবসাই রইল না। মীরজাফর ক্লাইবের নিকট ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন, কিন্তু বৃথাই।

মীরকাশেম ইংরাজের সঙ্গে যে বাণিজ্যচুক্তি করেন, তাতে ইংরাজেরা দেশী বাণিজ্যের উপর শতকরা ন'ভাগ শুল্ক দিতে রাজী হন। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে ইংরাজ বণিক চুক্তির সম্মান রক্ষা করলে না। ইংরাজ বণিক ও তাদের গোমস্তারা নিশান উড়িয়ে সারা দেশে অবাধ বাণিজ্য করতে লাগল। নবাবের কর্ম্মচারীরা তাদের কাছ থেকে শুল্ক আদায় করতে গিয়ে হেনস্তার একশেষ হল। এদিকে দেশী ব্যবসায়ীদের সংখ্যা দিন দিন কমতে লাগল।

নবাবের শুল্ক-বিভাগীয় দপ্তরে শুল্ক-অফিসার হুজরীমলের সঙ্গে কি একটা কাজে দেখা করতে সেদিন নন্দকুমার হুগলী গেছেন। হুজরীমল একদল দেশীয় ব্যবসায়ীকে শুল্ক ফাঁকি দেবার অভিযোগে আটকে রেখেছিলেন। নন্দকুমার জিজ্ঞাসাবাদ করায় ব্যবসায়ীরা বলতে লাগলেন ঃ

ইংরাজ ফিরিঙ্গি ও তাদের গোমস্তারা বিনা শুল্কে বাণিজ্য করে। দেশীয় ব্যবসায়ীরা নবাবকে শুল্ক দিয়ে ওদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবেন কেন! যারা এখনো কোন-মতে টিকে আছেন, ভবিষ্যতে তাঁরাও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র থেকে নিশ্চিহ্ন হতে বাধ্য। নবাবকে শুল্ক দেবার জন্য, এরপর একজন ব্যবসায়ীও আর থাকবে না।

—দেশ জুড়ে হাহাকার পড়ে গেছে হুজুর! আমাদের আর বাঁচবার কোন উপায় নেই।

হুজরীমল বললেন: নন্দকুমারজী! সবই জানি, সবই বুঝি। কিন্তু আমাদের হাত-পা বাঁধা।

নন্দকুমার ব্যবসায়ীদের বললেন: শুনেছি নবাব মীরকাশেম ইংরাজের চোখ রাঙানো গ্রাহ্য করেন না। আপনারা বরং নবাবের কাছে এই অবিচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করুন। ইংরাজ যদি বিনা শুল্কে বাণিজ্য করতে পারে, আপনারা কেন শুল্ক দেবেন!

যথাসময় নবাব মীরকাশেমের নিকট ব্যবসায়ীদের আবেদন পৌঁছল। মীরকাশেম ছিলেন দরিদ্রের বন্ধু। জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি—এই মহৎ গুণটী ছিল নবাব কাশেম আলির। মন্দির মসজিদ মানুষের চেয়ে বড় নয়। মানুষই যদি ভুখা রইল, কি হবে মসজিদের শোভা বাড়িয়ে? সিরাজউদ্দৌলা বহু অর্থব্যয়ে যে ইমামবাড়ী প্রস্তুত করিয়েছিলেন, নবাব মীর-কাশেম তার গৃহসজ্জা বিক্রয় করে, সমস্ত দরিদ্রকে বিলিয়ে

দিয়েছিলেন। রাজ্যের কোথাও দুর্ব্বল প্রজার উপর জমিদার উৎপীড়ন করছেন, খবর পেলে নবাব তখুনি তার প্রতিবিধান করতেন। দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার তিনি সহ্য করেননি। কোম্পানীর অন্যায় প্রতিযোগিতায় ব্যবসায়ীরা ক্রমেই ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, নবাব এজন্য ইংরাজকে কিছুতেই ক্ষমা করেননি। সেদিন প্রকাশ্য দরবারে নবাব মীরকাশেম গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট ও কাউন্সিলার হেষ্টিংসকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

—গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট! কাউন্সিলার হেষ্টিংস্! দেশের নবাব কে? আমি না তোমরা?

ভ্যান্সিটার্ট বিস্মিত হবার ভাণ করে বললেন ঃ Yes, Your Excellency!

নবাব বললেন ঃ তোমরা আমার সঙ্গে সন্ধি করেছিলে দেশীয় বাণিজ্যের উপর শতকরা ন'টাকা হারে রাজস্ব দেবে। সন্ধিভঙ্গ করে আজ তোমরা বিনাশুল্কে বাণিজ্য করছ। যদি আমার কর্ম্মচারী প্রতিবাদ জানায়, তোমরা তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করতে দ্বিধা কর না।

কাউন্সিলার হেষ্টিংস্ ঃ Your Excellency! কোম্পানীর বিরুদ্ধে হাপনার অভিযোগ কাউন্সিলে জানাইবেন। হামি বিচার করিবে।

হেষ্টিংসের কথা শুনে ক্রোধে নবাবের চোখমুখ লাল হয়ে উঠে। নবাব নিজেকে সংযত করে নিয়ে শান্তস্বরে

বললেন : নবাব তোমাদের কাছে আবেদন করবেন আর তোমরা করবে তার বিচার !…মহম্মদ তকী খাঁ !

তকী খাঁ কুর্ণিশ করে এগিয়ে এলেন : হজরৎ !

—হাটে বাজারে সহরে মোকামে সর্ব্বত্র ঘোষণা করে দাও দু'বছরের জন্য নবাব মীরকাশেম দেশী বাণিজ্যের উপর থেকে শুল্ক তুলে নিলেন। কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে দেশী ব্যবসায়ীরা বিনাশুল্কে বাণিজ্য করুক, এই আমি চাই।

তকী খাঁ কুর্ণিশ করে বললেন : যো হুকুম হজরৎ !

তকী খাঁ প্রস্থান করলেন। ভ্যান্সিটার্ট ও হেষ্টিংসের মুখে এক মুহূর্ত্ত কথা সরে না। নবাব তাঁদের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসেন।

অবশেষে হেষ্টিংস্ বললেন : এ হাপনি কি হুকুম দিলেন হজরৎ ! ইহাতে হাপনার লাখো লাখো তংকা ক্ষতি হইবে একবার ভাবিয়া দেখুন ! Just think of that.

মীরকাশেম : উপায় কি বল ! দেশীয় ব্যবসায়ীরা আজ ব্যবসা-বাণিজ্য গুটিয়ে বেকার বসে আছে। আমাকে রাজস্ব দিয়ে তোমাদের সঙ্গে অন্যায় প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে কেন ? দেশে হাহাকার পড়ে গেছে।

ভ্যান্সিটার্ট—গোস্তাকি মাফ করিবেন। But I must say হামাদের বাণিজ্য নষ্ট করিবার জন্য হাপনি এ-কাজ করিলেন।

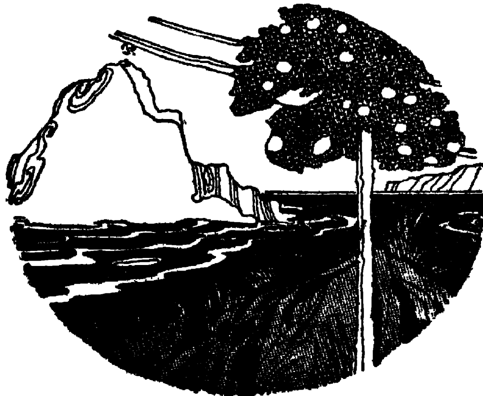
মীরকাশেম : তুমি ঠিকই ধরেছ গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট!

হেষ্টিংস্ : But Your Excellency! কোম্পানী নবাবের মিত্রশক্তি supporter—হাপনাকে তক্তে বসাইয়াছে।

মীরকাশেম : বটেই ত! কিন্তু কি করব বল? আমার দরিদ্র দেশবাসীর জন্য সব ক্ষতিই আমাকে সইতে হবে।

নবাব দেশী বাণিজ্যের উপর শুল্ক তুলে নিয়েছেন—খবরটা সারাদেশে রাষ্ট্র হয়ে পড়ল। ব্যবসায়ীরা আবার নব উদ্যমে কাজ-কারবার সুরু করলেন।

রাজস্ব খাতে সত্যিই নবাবের মোটা টাকা ক্ষতি হল। কিন্তু নবাবের চেয়েও বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হল কোম্পানী। ইংরাজ মীরকাশেমের উপর হাড়ে হাড়ে চটে গেল।



বিদ্রোহী নন্দকুমার

গদীচ্যুত নবাব জাফর আলি তখন হীন অবস্থায় মনের দুঃখে কলকাতায় নির্জ্জন বাস করছিলেন। মুর্শিদাবাদের হারানো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। সুখ স্বচ্ছন্দ ভোগ-বিলাসের অফুরন্ত উপকরণ! অগণিত দাস-দাসীর সেবা, অসংখ্য অনুগ্রহপ্রার্থীদের নিরন্তর তোষামোদ! নবাবী জীবনে শান্তি ছিল না; কিন্তু সমারোহ ছিল। ক্ষমতার লোভে তিনি ইমান্ দিয়াছিলেন, তাই শেষ পর্য্যন্ত খোদা তাঁর সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে, পথের ভিখারী করে ছাড়লেন। যে ইংরাজশক্তির বদান্যতার উপর তিনি সম্পূর্ণ নির্ভর করেছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত তারাই জীর্ণবস্ত্রের মত তাঁকে পরিত্যাগ করে দামাদ কাশেম-আলিকে তক্তে বসালে!

কোম্পানীর এই বেইমানির প্রতিশোধ নিতে জাফর আলির মন বিদ্রোহ করে।

—হুঁসিয়ার! হুঁসিয়ার! নবাব সুজাউল্ মুল্ক হাসাম-দৌল্লা মীর মহম্মদ জাফর আলি খাঁ মহবৎ জঙ্গ বাহাদুর!

আশী হাজার সৈন্য-বাহিনীর অধীশ্বর বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মালিক নবাব মীরজাফর!···মৌতাতের ঝোঁকে নবাব দিবাস্বপ্ন দেখেন,—বেইমান ইংরাজ শক্তির বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন! কিন্তু আফিমের নেশা টুটে যায়!

মীরজাফর নিঃশ্বাস মোচন করেন। বেইমানেরা তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কোন পথই খোলা রাখেনি। কোম্পানীর এক কথায় তিনি সুবোধ ছেলের মত সিংহাসন ছেড়ে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে কলকাতায় পালিয়ে এলেন। কিন্তু কোম্পানী তাঁর জীবিকার জন্য একটা মাসোহারার ব্যবস্থাও করে দিলে না!

নন্দকুমারের কথা মনে পড়ে। নন্দকুমার তাঁকে ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন! মীরজাফরের সঙ্গে তিনি একদিন দেখা করতে এসেছিলেন।...

মীরজাফরের পদচ্যুতি, নবাব মীরকাশেমের সঙ্গে কলহ, দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প গ্রাস, বিশেষ করে বাংলার দুটী প্রধান শিল্প—বস্ত্র ও লবণ শিল্প। ইংরাজ বণিকের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা নবাব, আমীর ওমরাহ থেকে সুরু করে দেশের সাধারণ তন্তুবায় ও শিল্পজীবী সবাইকে গ্রাস করছে। সুচতুর নন্দকুমারের বুঝতে বাকী রইল না, আরো কিছুদিন এ-ভাবে চললে দেশে দুর্ভিক্ষ সুরু হবে। কোম্পানীর শোষণে সারা দেশ জুড়ে সুরু হয়েছে হাহাকার।

নন্দকুমারের মনে পড়ল গুরুদেবের কথা। গুরুদেব বলেছিলেন, সময় যখন আসবে নন্দকুমার নিজেই বুঝতে পারবেন। সত্যিই তিনি আজ বুঝতে পেরেছেন, কোম্পানীর রাজত্বের অবসান না হলে দেশে শান্তি নেই। সময় নিকটবর্ত্তী। এবার কোম্পানীর বাঁধন ছিঁড়তেই হবে। নবাব মীরকাশেমের সঙ্গে কোম্পানীর যুদ্ধ আসন্ন।

আর একথাও ঠিক, নন্দকুমার ক্ষেমঙ্করীকে বললেন : কাশেম আলি যদি এ যুদ্ধে পরাজিত হন, এদেশে ইংরাজকে আর কেউ ঠেকাতে পারবে না।

ক্ষেমা : সে কথা ঠিক। নবাব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, একথাও তুমি বলেছিলে সেদিন।

নন্দকুমার : বলেছিলাম বই কি ক্ষেমা! কিন্তু নবাব সিরাজদ্দৌলাও কিছু কম প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর অগণিত সৈন্য, তাঁর অতুল ঐশ্বর্য্য, পলাশীর প্রান্তরে জয়ের মালা পরিয়ে দিতে পারেনি সিরাজকে। কেন? বেইমানদের জন্য।

ক্ষেমা : তাই ত সাবধানী নবাব, শেঠেদের মুঙ্গের দুর্গে আটকে রেখেছেন।

নন্দকুমার : তা রেখেছেন। কিন্তু বিপদ তাতে কাটেনি। বেইমান শুধু শেঠেরাই নয়। বেইমানি এদেশের আমীর ওমরাহের মজ্জাগত ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেইমান আজ ঘরে ঘরে।

নন্দকুমার একটু হেসে বললেন : শেষ পর্য্যন্ত কি হবে জানি না। সে কথা থাক। কিন্তু ক্ষেমা, আসন্ন যুদ্ধে দেশের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য ইংরাজের বিরুদ্ধে নবাবকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করা। তাই আমি স্থির করেছি, নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকায় আর থাকব না। কোম্পানীর বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াব।

ক্ষেমাদেবী : কিন্তু আমাদের ক্ষমতা কতটুকু! দেশে

প্রভাবশালী ও বিত্তবান বহু জমিদার ও শেঠ আছেন। সবাই মিলিত হয়ে একযোগে কাজ করলে, হয়ত ইংরাজ শক্তিকে কাবু করা সম্ভব।

নন্দকুমার ঃ সত্যি কথা। ব্যক্তিগত ভাবে ইংরাজ শক্তির কোন ক্ষতিই আমি করতে পারব না। কিন্তু দেশের বিভিন্ন শক্তিকে ইংরাজের বিরুদ্ধে উসকানি দিয়ে আমি সংগঠিত করব।

ক্ষেমা ঃ এ কাজে বিপদ কতখানি, তুমি জান!

নন্দকুমার ঃ বিপদ! বিপদের ভয়ে কর্ত্তব্য কাজ থেকে পিছিয়ে গেলে চলবে কেন ক্ষেমা? হ্যাঁ, আগামী সোমবার মেয়েদের কুমারী ব্রত উপলক্ষে আমি বিহারের কামাগর খাঁ, মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি শ্রীভট্ট, ফরাসী সেনাপতি মঁসিয়ে লা ও দেশের প্রতিপত্তিশালী জমিদারদের আমন্ত্রণ করব। এঁরা প্রত্যেকেই কোম্পানীর দুষমণ। দেখি এঁদের একত্রিত করতে পারি কিনা।

কোম্পানীর গুপ্তচর ও বেনিয়ানদের দৃষ্টি এড়াবার জন্যই নন্দকুমার কুমারী ব্রত উৎসব উপলক্ষে এঁদের আমন্ত্রণ করেছিলেন। বেনিয়ানদের সতর্ক দৃষ্টি কিছুই এড়ায় না। ইংরাজ প্রভুদের জন্য এরা সব কিছুই করতে পারে। যথাসময়ে গবর্ণর ভ্যান্সিটার্টের নিকট নন্দকুমারের বিরুদ্ধে রিপোর্ট গেল।

ইতিমধ্যে নন্দকুমার দিল্লীশ্বরের উজির অযোধ্যাধিপতি

সুজাদ্দৌলাকে কোম্পানীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে একখানি পত্র লিখলেন। দিল্লীশ্বর যেন ইংরাজ ফিরিঙ্গির মিষ্টি কথায় ভুলে গিয়ে ওদের সঙ্গে সন্ধি না করে বসেন। জাল-জুয়াচুরি প্রতারণা যাদের নীতি, তাদের কোনক্রমেই বিশ্বাস করা যায় না। তিনি যদি ইংরাজকে এ-দেশ থেকে বিতাড়িত করতে পারেন, নন্দকুমার বাংলাদেশ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে যুদ্ধের খরচা বাবদ এককোটী টাকা নজরানা দেবেন সুজাদ্দৌলাকে।

গুপ্তচর ও বেনিয়ানদের মহিমায় চিঠিখানি গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টের হস্তগত হল। ক্রোধে অধীর হয়ে ভ্যান্সিটার্ট সে-রাত্রেই গোরাবাহিনী নিয়ে নন্দকুমারের বাড়ী ঘেরাও করলেন।

বাড়ীর সামনে গোরা সিপাইর ছড়াছড়ি দেখে ক্ষেমাদেবী ভীতস্বরে বললেন: কি হবে গো!

নন্দকুমার তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: ভয়ের কি আছে! ধীর শান্ত পদক্ষেপে নন্দকুমার বাইরে বেরিয়ে এলেন ভ্যান্সিটার্টের সঙ্গে দেখা করতে।

নন্দকুমারকে দেখে ফেটে পড়লেন ভ্যান্সিটার্ট। হাপনি কোম্পানীর বিরুদ্ধে conspiracy করিয়াছে। কোম্পানীর ডুষমণ সেনাপতিরা হাপনার বাড়ীতে গোপনে মিলিত হইতেছেন। Besides—

নন্দকুমার: থাক লাটবাহাদুর, আর ফিরিস্তি দিয়ে কাজ নেই। এখন কি করতে চাও, তাই বল।

ভ্যান্সিটার্ট ঃ হাপনি ইংরাজ শক্তিকে এ-দেশ হইতে তাড়াইতে চাহে। আমি আপনাকে গৃহবন্দী করিবে।

নন্দকুমার ঃ কিন্তু তুমি যা বলছ তার প্রমাণ কোথায় ?

ভ্যান্সিটার্ট ঃ প্রমাণ এই চিঠি।

ভ্যান্সিটার্ট নন্দকুমারকে চিঠিখানি বারেক দেখিয়ে আবার পকেটে পুরলেন।

নন্দকুমার ঃ চিঠি লেখাটাই কি একটা মস্ত বড় অপরাধ ? বেশ, তাই যদি হয়, প্রকাশ্য আদালতে আমার বিরুদ্ধে অভি-যোগ কর। আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দাও। যদি অপরাধী প্রমাণিত হই—

ভ্যান্সিটার্ট ঃ Nothing doing.

নন্দকুমার ঃ বিনা বিচারে আমায় গৃহবন্দী করবে সাহেব ? তোমরা সু-সভ্য জাত। তোমাদের আইনেই আমার বিচার হোক।

ভ্যান্সিটার্ট ঃ আইন ! কোম্পানীর গভর্ণরের হুকুমই আইন। আজ থেকে হাপনি কোম্পানীর বন্দী। হাপনি মানী ব্যক্তি। তাই ঠাণ্ডি গারদে না পূরে হাপনাকে গৃহেই বন্দী করলাম।

নন্দকুমার ঃ তোমার দয়া লাটসাহেব !

ভ্যান্সিটার্ট ঃ পালাইবার চেষ্টা করিয়া বিপদ ডাকিয়া আনিও না।

নন্দকুমার ঃ পালাতেই যদি চাই, তোমাদের সাধ্য কি আমায় আটকে রাখে। কিন্তু ভয় নেই, পালাব না।

সংবাদটা মীরজাফরের কাণে যেতেই তিনি ভয়ে আৎকে উঠলেন। কোম্পানী তাঁকেও গ্রেপ্তার করবে না কি শেষ কালে? তিনিও ত ভ্যান্সিটার্ট, হলওয়েল প্রভৃতির বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে বিলাতে চিঠি দিয়ে দিয়েছেন।—চুক্তি ভঙ্গ করে কোম্পানী তাঁকে বে-আইনি ভাবে গদীচ্যুত করেছে।

কিন্তু মণিবেগম অভয় দিলেন তাঁকে। হুজরতের ভয় নেই। কোম্পানী তাঁর বিরুদ্ধে কিছু করবে না।



বন্ধু-বিচ্ছেদ

কোম্পানীর সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য্য। একথা ইংরাজের চেয়ে নবাব মীরকাশেম কিছু কম উপলব্ধি করেন নি। তাই তিনিও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেন নি।

মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে তিনি রাজধানী স্থাপন করলেন। মুঙ্গেরের পুরাতন কেল্লা মেরামত করা হল। যুদ্ধাস্ত্রের কারখানা প্রতিষ্ঠা করে কর্ম্মকুশল শিল্পকারের তত্ত্বাবধানে গোলাবারুদ, কামান-বন্দুক তৈরী হতে লাগল। গুরগিন খাঁ, মার্কার, সমরু প্রভৃতি আর্ম্মেনিয়ান রণনীতি বিশারদেরা নবাবের বাহিনীকে পাশ্চাত্ত্য রীতিতে রণবিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগলেন। শুধু সৈন্য-বাহিনী সংগঠনে নয়, শাসন-কার্য্যেও নবাব দক্ষতার পরিচয় দিলেন। তিনি দুর্নীতিপরায়ণ রাজকর্ম্মচারীদের বরখাস্ত করলেন।

সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে কোম্পানীকে মোটা টাকা দিতে হবে। এদিকে রাজকোষ অর্থশূন্য। নবাব ব্যয় সঙ্কোচ করে অর্থসঞ্চয় করতে লাগলেন।

নবাব শেঠেদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করবার জন্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেঠেরা নানা ছলছুতো করে তাঁর আহ্বান এড়িয়ে গেলেন। ইংরাজের সঙ্গে মীরকাশেম যুদ্ধ করেন, শেঠেরা তা চান নি। অথচ যুদ্ধ অনিবার্য্য। রাজনৈতিক আকাশ

ঘন ঘটাচ্ছন্ন। জয়-পরাজয়ের কথা কে বলতে পারে! এ অবস্থায় নবাব দরবারে কোন ভরসায় শেঠেরা টাকা লগ্নী করবেন?

শেঠেদের আচরণে মীরকাশেমের অতীতের কথা মনে পড়ে। যুদ্ধ বাধলে শেঠেরা এবারও যে ইংরাজের পক্ষ গ্রহণ করবেন না, তার কি প্রমাণ।

সাবধানী নবাব জগৎশেঠ, রাজবল্লভ ও স্বরূপচাঁদকে আটকে রাখলেন।

কোম্পানীর তরফ থেকে প্রতিবাদ এল। নবাব উত্তর দিলেনঃ শেঠেরা নবাবের প্রজা। বিশেষ রাজকার্য্যে তিনি তাদের মুঙ্গের দুর্গে আটকে রেখেছেন। কোম্পানীর মাথাব্যথা কেন?

মুর্শিদাবাদের শেঠেদের ভেতর শুধু একজন শেঠ মীর-কাশেমের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি শেঠ বুলাকী দাস। বুলাকীদাস নবাবকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করতে রাজী হন। নবাব বুলাকীদাসকে ব্যাঙ্কার নিযুক্ত করে মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গের নিয়ে যান।

সেদিন মুঙ্গের দরবারে কাউন্সিলার হেষ্টিংস বিনীতভাবে কুর্ণিশ করে জানালেন যে, নবাব মীরকাশেম সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করেছেন।

মিথ্যে কথা। নবাব বললেনঃ বরং তোমাদের সন্ধির সব সর্ত্তই আমি পালন করেছি। জাফর আলির দেনা শোধ করতে বাংলার তিন তিনটে পরগণা—বর্দ্ধমান, চট্টগ্রাম ও

মেদিনীপুর চিরস্থায়িভাবে কোম্পানীকে হস্তান্তরিত করলাম। দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধের খরচা দিলাম পাঁচলক্ষ তংকা। এমন কি তোমাদের ঘুষের টাকাও আমি কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দিয়েছি। আর কি চাও তোমরা কাউন্সিলার হেষ্টিংস্‌?

হেষ্টিংস্‌ কুর্ণিশ করে বললেনঃ Your Excellency! গোস্তাকি মাফ করবেন। হাপনি কোম্পানীর সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করিতেছে না।

নবাব হেসে উঠলেন! বললেনঃ জাফর আলি বন্ধুর মত ব্যবহার করেও তোমাদের হাত থেকে রেহাই পান নি। যাক সেকথা। সন্ধিভঙ্গ আজো আমি করি নি। তোমরাই সন্ধিভঙ্গ করে আমার রাজকার্য্যে বাধা দিচ্ছ। অথচ দোষ চাপাচ্ছ আমারই ঘাড়ে! কিন্তু একথা আজ আমি তোমাদের স্পষ্ট করে বলতে চাই, প্রজার সর্ব্বনাশ সাধন করে কোম্পানীর অর্থো-পার্জ্জনের সহায়তা আমি করব না।...

জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, স্বরূপচাঁদ মুঙ্গের দুর্গে বন্দী। কিন্তু নবাব তাঁদের ধর্ম্মে-কর্ম্মে বাধা দিলেন না। দুর্গ-প্রাকারের বাইরে নিত্য গঙ্গাস্নানে যেতে পাছে অসুবিধে হয়, সেজন্য নবাব নিজের নামাঙ্কিত একখানি পাঞ্জা তাঁদের দিলেন। সেই পাঞ্জা দেখিয়ে তাঁরা ইচ্ছামত দুর্গের বাইরে যাতা-য়াত করতেন।

শেঠেদের সহানুভূতি লাভ করবার জন্য নবাব আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু বৃথাই।

শ্রেষ্ঠী জগৎশেঠ মহতাবচাঁদ! রাজা রাজবল্লভ! শ্রেষ্ঠী স্বরূপচাঁদ! নবাব বলতে লাগলেন ঃ ইংরাজ পরদেশী। কিন্তু এ দেশ আপনাদের। ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে একবার দেশের দিকে ফিরে তাকান। জাতির কথা ভাবুন। এখনো সময় আছে। ইংরাজ শোষণ সম্পূর্ণ। তারা এবার মসনদ চায়। দেশের স্বাধীনতা-সূর্য্য চিরতরে অস্তমিত হতে চলেছে। আসুন! আমরা সবাই একমন একপ্রাণ হয়ে পলাশীর কলঙ্ক মোচন করি।

হজরৎ! জগৎশেঠ বললেন ঃ অধীনেরা মালিকের দাসানুদাস। নবাবের ইচ্ছাই আমাদের ইচ্ছা।

আবার সেই চাটুবাক্য! মীরকাশেম ক্লান্ত হয়ে কুর্সিতে বসে পড়লেন। বললেন ঃ আমার সেনাদল সুশিক্ষিত, সেনাপতিরা দক্ষ। আমার অস্ত্র-শস্ত্র গোলাবারুদ কোন অংশেই ইংরাজ বণিকের চেয়ে হীন নয়। যদি যুদ্ধ বাধে, ভয় আমার ইংরাজদের নয়। ভয় করি আমি বেইমানদের।

স্বরূপচাঁদ ঃ হজরৎ কি তবে আমাদের রাজভক্তিতে সন্দেহ পোষণ করেন?

জগৎশেঠ ঃ জানি না কি কারণে জাঁহাপনা আমাদের উপর বিরূপ! কেনই বা আমাদের এখানে নজরবন্দী করে রেখেছেন! কিন্তু এ-কথা ঠিক—মালেকের জন্য আমাদের অদেয় কিছুই নেই।

রাজবল্লভ ঃ হজরৎ! ইংরাজকে আপনি এদেশ থেকে

তাড়াবেন, তার চেয়ে খুশীর কথা আর কি হতে পারে। ফিরিঙ্গি-দের এদেশ থেকে যত শিগ্‌গীর তাড়ানো যায় ততই মঙ্গল।

জগৎশেঠঃ হুকুম করুন হজরৎ! কি কাজে লাগতে পারি আমরা?

নবাবঃ আপনাদের আমি দক্ষিণহস্ত রূপে পেতে চাই। আপনারা সহায় থাক্‌লে, অর্থসংগ্রহের অভাব আমার থাকবে না। কথা দিন, আবশ্যকমত আমায় টাকা ধার দেবেন।

জগৎশেঠঃ গোস্তাকি মাফ করবেন জাঁহাপনা। নবাব সরকারে আজো আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকা পাওনা। এ অবস্থায় আবার নতুন করে ঋণ দেওয়া···

স্বরূপচাঁদঃ যুদ্ধে জয় পরাজয় অনিশ্চিত। কোন্ ভরসায় এই অনিশ্চিত অবস্থায় টাকা ধার দেওয়া যায় জাঁহাপনা?

নবাবের মুখের উপর এতবড় কথা শুধু শেঠেরাই বলতে পারেন। ক্রোধে মীরকাশেম আরক্তিম হয়ে উঠলেন। কিন্তু সুচতুর নবাব আত্মসংবরণ করতে জানেন। আস্তে আস্তে বললেনঃ ভুলেই গিয়েছিলাম ইংরাজ ফিরিঙ্গি ও আপনাদের পেশা একই। সুযোগ পেলে দেশের স্বাধীনতা বিক্রী করতেও আপনারা পেছপা নন।

সমরু এসে খবর দেয়—কলকাতা থেকে অমিয়েট্ ও হে সাহেব জাঁহাপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

মীরকাশেম শেঠেদের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ আপনারা তাহলে এবার আসুন!

শেঠেরা ও রাজবল্লভ কুর্ণিশ করে প্রস্থান করলেন।

পরক্ষণেই সমরু অমিয়েট্ ও হে সাহেবকে নিয়ে প্রবেশ করল।

নবাব বললেনঃ হঠাৎ তোমরা এখানে? কি খবর বল দিকি!

হে সাহেব কুর্ণিশ করে বললেনঃ Your Excellency! কৌন্সিলের তরফ থেকে শান্তির প্রস্তাব করিতে হামিলোগ আসিয়াছে।

অমিয়েট্ বললেঃ কোম্পানী নবাবকে একথা জানাতে চায়, we do not want war. ইংরাজ যুদ্ধ চাহে না। হুজরতের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ ভাবে মীমাংসা করিতে চাহে। ইংরাজ নবাবের মিত্রশক্তি।

নবাব স্থিরদৃষ্টিতে শান্তির দূতদ্বয়ের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ হঠাৎ শান্তির বার্ত্তা নিয়ে তোমরা এখানে? কি ব্যাপার বলত! হুঁ, বুঝতে পেরেছি। যুদ্ধের আয়োজন এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। কিছুদিন সময় চাই।···তোমাদের মতিগতি জানতে আমার আর বাকী নেই সাহেব!

নবাবের কথা শেষ হতে না হতে তকী খাঁ ছুটে আসেন। কুর্ণিশ করে বলেনঃ মালেক! দুর্ব্বৃত্ত এলিস সাহেব অতর্কিত আক্রমণ করে পাটনা দুর্গ ছারখার করেছে।

উত্তেজনায় নবাব কুর্সি থেকে লাফিয়ে উঠলেনঃ তকী খাঁ!

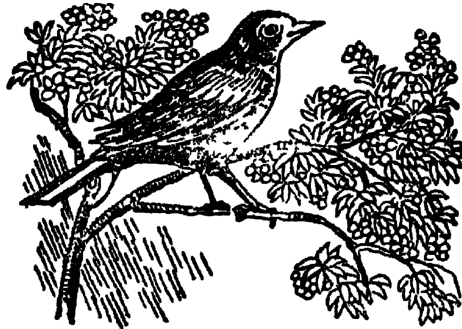
—যা বলছি তার একবর্ণও অতিরঞ্জিত নয় জাঁহাপনা!

ইংরাজেরা শুধু দুর্গ দখল করে নি। পাটনার নাগরিকদের উপর ভীষণ অত্যাচার সুরু করেছে। ওদের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী শুনে স্থির থাকা যায় না হজরৎ! লুটতরাজ, হত্যা ও অগ্নিদাহে পাটনা ছারখার হয়েছে।

নবাব অমিয়েট্ ও হে সাহেবের দিকে ফিরে বললেন: তাহলে তোমরা যুদ্ধ চাও না! শান্তির প্রস্তাব নিয়ে নবাবের কাছে এসেছ! মহম্মদ তকী খাঁ!

মহম্মদ তকী খাঁ কুর্ণিশ করে এগিয়ে এল।

—বন্দী কর এই বেইমানদের! পাটনা, মুঙ্গের, বাংলা, বিহার যেখানে যত ইংরাজকুঠী আছে সব অবরোধ কর। যেখানে যত ইংরাজ ব্যবসায়ী আছে সবাইকে বন্দী কর। পাটনার হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ চাই! প্রতিশোধ!



আবার মীরজাফর

মধ্যাহ্নভোজনের পর খানিকটা আফিম গলাধঃকরণ করে মীরজাফর দিবানিদ্রা উপভোগ করছিলেন।

হুজরৎ! মালেক! মণিবেগম ঘরে ঢুকে তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়ে ডাকলেন: জাঁহাপনা!

জাফর আলির তন্দ্রা টুটে গেল। বিরক্তস্বরে তিনি বললেন: আঃ! কি তামাসা করছ! জাঁহাপনা? কে জাঁহাপনা?

মণিবেগম কুর্ণিশ করে স্মিতমুখে বললেন: বাঁদীর গোস্তাকি মাফ করবেন। এ সময়ে নবাবের ঘুম ভাঙ্গাবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু খবরটা পেয়ে খুসীতে দিল্ ভরে উঠল। জাঁহাপনাকে এ সংবাদটা না দিয়ে কি আমি থাকতে পারি?

আবার জাঁহাপনা! মীরজাফর ধমক দিয়ে বললেন: শেষ পর্য্যন্ত তুমিও আমার সঙ্গে তামাসা করতে স্বরু করলে মণিবেগম?

তামাসা! মণিবেগম বললেন: তামাসা হবে কেন মালেক! আপনাকে মুর্শিদাবাদের তক্তে বসাবার ব্রত নিয়েছি আমি।

মীরজাফর: হুঁ। ওসব কথা ঢের শুনেছি। কি তোমার নতুন খবর তাই বল!

মণিবেগম ঃ কাশেম আলির সঙ্গে কোম্পানীর যুদ্ধ বেধেছে।

সত্যি বলছ মণিবেগম! মীরজাফর উত্তেজনায় উঠে বসলেন। কাশেম আলি ইংরাজের সঙ্গে সত্যিসত্যিই লড়াই করবে? মনের জোর আছে কাশেম আলির। এই ত চাই। বেত্‌মিজ ফিরিঙ্গিদের আমি সায়েস্তা করতে পারিনি। দামাদ্‌ কাশেম আলি যদি সায়েস্তা করে ভারী খুসী হব।

মণিবেগম ঃ মালেকের মুখে একি কথা আজ! কাশেম আলি আমাদের শত্রু। হুজরতের সঙ্গে বেইমানী করে সে তক্ত দখল করেছে। ইংরাজ আমাদের মিত্রশক্তি।

মীরজাফর ঃ হঠাৎ যে তুমি কোম্পানীর উপর প্রসন্ন হয়ে উঠলে? ব্যাপার কি মণিবেগম?

মণিবেগম মুখ টিপে হাসতে লাগলেন।

মীরজাফর ঃ ফিরিঙ্গিরা আমায় গদীচ্যুত করে নি? তবু যদি বেইমানেরা আমার মাসোহারার একটা ব্যবস্থা করত!

মণিবেগম ঃ চুপ্‌ চুপ্‌। আর ওকথা বলবেন না মালেক! কোম্পানী হুজরতকে মুর্শিদাবাদের গদীতে বসাতে চাইছে আবার।

মীরজাফর একমুহূর্ত্ত চুপ করে বসে রইলেন। নবাবী গদীতে আবার বসবেন বলে যেমন তাঁর আনন্দ হল, তেমনি কোম্পানীর আজ্ঞাবহ ভাড়াটে হিসাবে কাজ করতে হবে বলে, মীরজাফরের মন বিষাদে ভরে গেল।

কি ভাবছেন হজরৎ ? মণিবেগম বললেন।

মীরজাফর : ভাবছি, এমন সুখবরটা তুমি কোথায় সংগ্রহ করলে বল ত ? কোম্পানী আমাকে নবাবী না দিয়ে, নিজেরাও ত গদীতে বসতে পারে ?

মণিবেগম : হজরত ! কোম্পানী ভাল করেই জানে, কাশেম আলিকে যুদ্ধে পরাজিত করতে হলে, আপনাকেই মুর্শিদাবাদের গদীতে বসাতে হবে। দেশের লোক ওদের উপর ক্ষেপে আছে।

মীরজাফর : হুঁ। সেজন্যই আমাকে শিখণ্ডী সাজিয়ে গদীতে বসাতে চায়। কিন্তু দেশের লোক একথাও জানে, মীরকাশেমই ওদের সত্যিকার নবাব।

মণিবেগম : আজ হঠাৎ বেইমান কাশেম আলির উপর জনাবের দরদ উথলে উঠল কেন বুঝতে পারছি না।

মীরজাফর : বেইমানের সঙ্গে কাশেম আলি বেইমানি করেছে, কিন্তু প্রজার সঙ্গে করে নি। না মণিবেগম, ইংরাজের ভিক্ষার দান এই নবাবী আমি গ্রহণ করতে পারব না।

মণিবেগম : জাঁহাপনা ! আপনার মুখে এ-কথা শোভা পায় না। কাশেম আলি বিদ্রোহী। নবাবী তক্তে বসে কাশেম আলিকে শাস্তি দেবেন আপনি।

মীরজাফর : নবাব ! কে নবাব ?

মণিবেগম : হজরত ! আমি কোম্পানীর সঙ্গে পাকাপাকি

করে এসেছি। এক্ষুনি তারা নবাবের কাছে আসবে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করাতে।

মীরজাফর ঃ আবার সন্ধিপত্র! না বেগম, সে হয় না!

মণিবেগম ঃ আমি ওদের কথা দিয়েছি জাঁহাপনা!

মীরজাফর ঃ কথা! ইংরাজ ফিরিঙ্গীর কাছে কথার কি কী দাম আছে?—কোম্পানীর হাতের পুতুল হয়ে মুর্শিদাবাদের নবাবী কেন সারা বিশ্বের অধীশ্বরও আমি হতে চাইনে। ঢের শিক্ষা হয়েছে, আর নয়।

মণিবেগম ঃ হজরৎ! আগে গদীতে বসুন। কাশেম আলি পরাজিত হোক। তারপর দেখা যাবে।...

মীরজাফর ঃ তারপর কি হবে মণিবেগম?

মণিবেগম ঃ তারপর হজরতও কাশেম আলির মত কোম্পানীর অন্যায় আবদার সহ্য করবেন না। কোম্পানী দ্বিতীয়বার আপনাকে গদীচ্যুত করতে সাহস করবে না।

মীরজাফর ঃ কিন্তু কোম্পানীর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করবার মত শক্ত মেরুদণ্ড নেই আমার।

মণিবেগম ঃ হজরৎ নিজে কেন ওদের সঙ্গে ঝগড়া করবেন! এমন একজন শক্ত লোককে দেওয়ান নিযুক্ত করলেই হবে, যে ইংরাজের ভাড়াটে নয়।

মীরজাফর ঃ তা যদি বল, একমাত্র নন্দকুমারই আমার দেওয়ান হবার উপযুক্ত ব্যক্তি। কিন্তু মণিবেগম, নবাবী গদীতে বসবার মত উৎসাহ আমার আর নেই।

হুজরত! অন্ততঃ নাজামদ্দৌল্লার মুখ চেয়ে ইংরাজের সঙ্গে সন্ধি করতে আপত্তি করবেন না।

—সুজাউল্ মুল্ক হাসামদ্দৌল্লা মীর মহম্মদ জাফর আলি খাঁ মহবৎ জঙ্গ বাহাদুর কি জয়!

গবর্ণর ভ্যান্সিটার্ট ও কাউন্সিলের সভ্যরা প্রবেশ করলেন। যথারীতি তাঁরা নবাবকে কুর্ণিশ করেন।

ভ্যান্সিটার্ট: Your Excellency। হাপনাকে পুনরায় নবাবী গদীতে বসাইতে কোম্পানীর আপত্তি নাই। বেগম সাহেবার সহিত এ বিষয়ে হামাদের কথাবার্ত্তা হইয়াছে। তিনি হামাদের সব সর্ত্তে রাজী হইয়াছে। Here it is. হাপনি পড়িতে পারে।

গবর্ণর সন্ধিপত্র নবাবের সামনে রাখলেন।

মণিবেগম: না না, পড়বার কি দরকার আর! আপনারা আমাদের পুরাণো বন্ধু। আপনারা লিখে এনেছেন, আমরা কি অবিশ্বাস করতে পারি? জাঁহাপনা!

মীরজাফর বারেক ইতস্ততঃ করে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন: আশা করি এবারকার সন্ধিপত্রের সম্মান কোম্পানী রক্ষা করবেন।

Certainly certainly! ভ্যান্সিটার্ট বললেন: হামিলোগ কাশেম আলিকে গদীচ্যুত করিয়াছে। বিদ্রোহী কাশেমের মাথার দাম কোম্পানী লাখটাকা ঘোষণা করিয়াছে।

মীরজাফর বিদ্রূপ করে বললেন: বল কি সাহেব!

মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি—



বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাবের মাথার দাম মাত্র এক লাখ টাকা!

মণিবেগম ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন: হজরৎ! সাহেবদের এবার ছুটি দিন।

মীরজাফর: হ্যাঁ। মণিবেগম, আমি তাহলে কাগজপত্রে আবার নবাব নিযুক্ত হলাম। কাগজের পুতুল।

মণিবেগম: এ কি কথা জাঁহাপনা!

মীরজাফর: কিন্তু সন্ধিপত্র দেখে মনে হচ্ছে, কোম্পানী এবার বেশ মোটা টাকাই দাবী করেছেন। ভাবছি, ওদের দাবী আমি কেমন করে মেটাব?

মণিবেগম: জাঁহাপনা! সে ভাবনা আমার। আপনি নিশ্চিন্ত হন।

মীরজাফর ভ্যান্সিটার্টের দিকে তাকালেন।

মীরজাফর: আমার একটা অনুরোধ লাট সাহেব! নন্দকুমারকে আমি দেওয়ান নিযুক্ত করব।

ভ্যান্সিটার্ট: সেই ইংরাজ-বিদ্বেষী নন্‌কুমারকে হাপনি দেওয়ান নিযুক্ত করিবেন?

হেষ্টিংস্: কোম্পানী তাহাকে গৃহবন্দী করিয়াছে।

মীরজাফর: জানি। কিন্তু এখন থেকে তিনি আমার দেওয়ান। অবিলম্বে তাঁকে মুক্তি দিতে হবে।

ভ্যান্সিটার্ট: Well! নন্‌কুমারের প্রতি হাপনার এই অযাচিত অনুগ্রহের কি কারণ, হামি জানে না। কিন্তু সে ইংরাজের শত্রু।

হেষ্টিংস্ঃ Impossible! নবাবের অনুরোধ রক্ষা করা অসম্ভব।

মীরজাফরঃ সাহেব! আমি তোমাদের সব সর্ত্তে রাজী হলাম, আর তোমরা আমার একটা অনুরোধও রাখবে না?

মণিবেগমঃ জাঁহাপনা!

মীরজাফরঃ তুমি থাম মণিবেগম। লাট বাহাদুর! আমি আর একবার অনুরোধ করছি তোমাদের, নন্দকুমারকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। তিনি আমার দেওয়ান।

মীরজাফরের দৃঢ়তা দেখে সাহেবেরা ত' অবাক। নিজেদের ভেতর কিছুক্ষণ আলোচনার পর অবশেষে তাঁরা নন্দকুমারকে মুক্তি দিতে রাজী হলেন।

অবশেষে নন্দকুমার মুক্তি লাভ করলেন।



আবার জগৎশেঠ

কোম্পানী নবাব জাফর আলির পক্ষ নিয়ে বিদ্রোহী কাশেম আলির সঙ্গে যুদ্ধ করছে। দেশের জমিদারবর্গ জানুন, কাল সিপাই জেনে রাখুক, ইংরাজ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যুদ্ধ করছে না, তারা এক ধর্ম্মযুদ্ধে অবতীর্ণ! নবাব মীরজাফর ইংরাজ প্রভুদের অনুরোধে যুদ্ধ-শিবির পরিদর্শনে এসেছেন। সঙ্গে মণিবেগম।

গঙ্গাতীরে ইংরাজ সৈন্যের তাঁবু পড়েছে। মীরজাফরকে সেখানে নিয়ে আসার আর একটা কারণ ছিল। মুঙ্গের দুর্গ নৌকোযোগে সেখান থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ। গুপ্তচরের মারফতে শেঠেদের খবর দেওয়া হল, নবাব মীরজাফর নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাঁদের জন্য প্রতীক্ষা করবেন।

...নিশুতি রাত। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। মণি-বেগমের হাত ধরে হোঁচট খেয়ে খেয়ে, শিবির থেকে বেশ খানিকটা দূরে, গঙ্গাতীরে এক ভগ্নমন্দির-প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হলেন মীরজাফর।

আমার ভয় করছে মণিবেগম! নবাব ফিস ফিস করে মণিবেগমকে বললেন: এই নিশুতি রাতে এখানে না এলেই ভাল হত।

মণিবেগম অভয় দিয়ে বললেন: ব্যস্ত হবেন না মালেক! ফিরিঙ্গি সিপাই আমাদের পাহারা দিচ্ছে। ভয় কি!

মীরজাফর: কিন্তু কই, জগৎশেঠ ত' এখনো এলেন না?

মণিবেগম: আসবেন বলে খবর যখন পাঠিয়েছেন, নিশ্চয়ই আসবেন হজরৎ!

আকাশে মিটমিট করে দু'একটা তারা জ্বলছে। মীরজাফর সেদিকে তাকিয়ে বললেন: রাত গভীর হয়ে এল। মনে হচ্ছে জগৎশেঠ আর আসবেন না।

পরক্ষণেই নীচে গঙ্গার জলে নৌকোর ছিপের শব্দ উঠল। জগৎশেঠ ও স্বরূপচাঁদ উপরে উঠে এলেন।

বন্দেগী হজরৎ! বন্দেগী বেগম সাহেবা! তাঁরা কুর্ণিশ করেন। অন্ধকারে পাশের মানুষটার মুখ দেখা যায় না। জগৎশেঠের সঙ্গে যে ইংরাজ প্রহরী এসেছিল, মশাল হাতে সে সামনে এগিয়ে এল।

মীরজাফর: আমি ত' ভাবলাম শেষ পর্য্যন্ত বুঝি দুর্গ থেকে বেরোতেই পারলেন না!

জগৎশেঠ: বাইরে বেরোবার কোন অসুবিধা নেই হজরৎ! নবাব মীরকাশেমের নামাঙ্কিত পাঞ্জা রয়েছে আমাদের কাছে। নিত্য গঙ্গাস্নানে দুর্গ-প্রাকারের বাইরে যেতে পাছে অসুবিধা হয়, তাই নবাব এই পাঞ্জা দিয়েছেন আমাদের। তবে হ্যাঁ, রাত্রে বেরোবার নিয়ম নেই। প্রহরীদের ঘুষ দিয়ে প্রাণ হাতে করে নবাবের কাছে ছুটে এসেছি। নবাব যদি জানতে পারেন, আর রক্ষা থাকবে না।

স্বরূপচাঁদ ঃ হজরৎ! কাশেম আলি যাতে পরাজিত হন সেই ব্যবস্থাই করতে হবে।

মণিবেগম ঃ সেজন্যই ত' আপনাদের এখানে ডেকে পাঠিয়েছি। শেঠেদের সাহায্যেই হজরৎ সিরাজকে ধ্বংস করে মুর্শিদাবাদের তক্তে বসেছিলেন। আজ আবার বিদ্রোহী কাশেম আলিকে ধ্বংস করবার জন্য নবাব আপনাদের শরণাপন্ন।

জগৎশেঠ ঃ হজরৎ! কাশেম আলি আমাদের মুঙ্গের দুর্গে আটকে রেখেছেন, একদিন এর জন্য তাঁকে জবাবদিহি হতে হবে।

মীরজাফর ঃ নিশ্চয়ই। কিন্তু কাশেম আলিকে পরাজিত করবার একমাত্র উপায় উৎকোচ দিয়ে ওঁর সেনানায়কদের ইমান্ কিনে নেওয়া।

স্বরূপচাঁদ ঃ হজরতের অনুমান মিথ্যা নয়।

মণিবেগম ঃ এ কাজে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

মীরজাফর ঃ আমার আর্থিক অবস্থার কথা, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন।

জগৎশেঠ ঃ সবই জানি হজরৎ! কিন্তু শেঠেরা বেঁচে থাকতে উৎকোচের টাকার জন্য কিছু ভাবতে হবে না জনাবকে। ইংরাজের সঙ্গে সব ব্যবস্থাই আমরা করেছি। তা' হলে আজ আসি হজরৎ! রাত ভোর হওয়ার আগেই মুঙ্গের দুর্গে পৌঁছতে হবে। কে জানে নবাবের গুপ্তচর আমাদের পিছু নিয়েছে কি না!

স্বরূপচাঁদ ঃ তাহলে ত' গেছি !

মণিবেগম ঃ কাশেম আলি আপনাদের কোন ক্ষতিই করতে সাহস করবেন না শেঠজী! আপনারা মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন। শেঠেদের প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা মীরকাশেমের অজানা নেই।

জগৎশেঠ ও স্বরূপচাঁদ বিদায় গ্রহণ করলেন। আস্তে আস্তে নৌকোর ছিপের শব্দ দূরান্তরে মিলিয়ে যায়।

মীরজাফর উঠে দাঁড়ালেন, বললেন ঃ তাহলে খোদার ইচ্ছায় সবই ঠিক আছে, কি বলো ?

খোদার ইচ্ছায় !···মণিবেগম পুনরাবৃত্তি করলেন ঃ আসুন হজরৎ! শিবিরে ফেরা যাক।

হ্যাঁ, চল।

সহসা অন্ধকারের বুক চিরে আর্ত্তনাদ করে উঠল বিউগল। সঙ্গে সঙ্গে তোপধ্বনি সুরু হল। মীরজাফর প্রাণভয়ে মণিবেগমের আড়ালে আত্মগোপন করবার চেষ্টা করেন। আর্ত্তস্বরে বললেন ঃ মণিবেগম! সর্ব্বনাশ হয়েছে। শত্রুসৈন্য ইংরাজ শিবির ঘেরাও করে ফেলেছে। আর রক্ষা নেই !

শান্ত হন হজরৎ! মণিবেগম বললেন ঃ ইংরাজসেনা কুচকাওয়াজ করছে। রাতের অন্ধকারে তারা কাটোয়া আক্রমণ করবে।

কাটোয়া! মীরজাফর স্বস্তির নিঃশ্বাস মোচন করেন।

বিদায় বন্ধু মীরকাশেম

কাটোয়ার যুদ্ধে নবাবের অন্যতম দক্ষিণ-হস্ত সেনাপতি তকী খাঁ নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মীরকাশেমের ভাগ্য-রবি পশ্চিমাকাশে অস্ত যেতে সুরু করলেন। তকী খাঁ নিহত হওয়ার পর নবাবসেনার সে উৎসাহ আর রইল না। এদিকে ফৌজদার সৈয়দ আহমদ বেইমানি করে ফৌজ হটিয়ে নিলে। ইংরাজ কাটোয়া অধিকার করল।

মুর্শিদাবাদেও তাই হল। বলতে গেলে বিনা যুদ্ধেই ইংরাজ রাজধানী দখল করল। সেদিনই কোম্পানীর আদেশে ইংরাজসেনা মীরকাশেমের ব্যাঙ্কার শেঠ বুলাকীদাসের গদী লুঠ করলে। ধনরত্ন মণি-মাণিক্য শেঠ বুলাকীদাসের আর কিছুই রইল না।···এমনি ভাবে কাশেম আলির ভাগ্যের সঙ্গে বুলাকীদাসের ভাগ্য জড়িয়ে পড়ল।······

এরপর গিরিয়ার যুদ্ধ। গিরিয়ার যুদ্ধে নবাবের জয় নিশ্চিত। ইংরাজসৈন্য ক্ষত-বিক্ষত, পলায়নরত। এমনি সময় শের আলি বেইমানি করে ফৌজ হটাতে সুরু করল। তুলে দিল জয়-পতাকা পলায়নরত ইংরাজের হাতে।

কাটোয়া গেল, গিরিয়া গেল—এরপর উধুয়ানালা। ভাগীরথীতীরে উধুয়া পাহাড়ের পাশে নবাবী আমলের পুরানো কেল্লা। একপাশে ভাগীরথী, অন্যপাশে উধুয়া। সুদৃঢ়

প্রাচীরবেষ্টিত কেল্লাটির পাশ দিয়ে বাদশাহী রাজপথ মুর্শিদাবাদ থেকে পাটনা অবধি চলে গেছে। রাজপথের একপাশে ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালা—অন্যদিকে গভীর জলরাশি। দুর্গসংস্কার করে দুর্গ-প্রাচীরে সারি সারি কামান সাজিয়ে শত্রুসেনার গতিরোধ করবার জন্য বহু সংখ্যক সৈন্য নিযুক্ত করলেন মীরকাশেম। উধুয়ানালার সুদৃঢ় দুর্গপ্রাকার দীর্ঘকাল গোলাবর্ষণেও ভেদ করার সম্ভাবনা ছিল না। ইংরাজসেনা তোপমঞ্চ থেকে গোলাবর্ষণ করে দুর্গ-প্রাকার ভেদ করবার চেষ্টা করে বিফল-মনোরথ হল। এদিকে রাতের অন্ধকারেও গভীর জলপথ অতিক্রম করে দুর্গমূলে পৌঁছানো অসম্ভব। দিনের পর দিন ইংরাজসেনা শিবিরে অপেক্ষা করে হতাশ হয়ে পড়ল। উধুয়ানালা দুর্গ জয় করবার কোন সম্ভাবনা নেই!

জলপথ পার হওয়ার একটি মাত্র গোপন পথ ছিল। এক জায়গায় একটি উঁচু বাঁধের মত। বাঁধের উপর জল এত কম যে অনায়াসে পায়ে হেঁটে পারাপার হওয়া যায়। এই গোপন পথের সন্ধান ইংরাজ জানত না।

মুঙ্গের দুর্গে নজরবন্দী শেঠেরা উৎকোচ-মহিমার প্রভাবে উধুয়ানালার গোপন পথের মানচিত্র সংগ্রহ করে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

সেদিন গভীর রাতে নবাবের বন্দী জনৈক ইংরাজ, শেঠেদের পাঞ্জার সাহায্যে দুর্গ থেকে বেরিয়ে উধুয়ানালার ইংরাজ-শিবিরের উদ্দেশ্যে ধাবিত হল।

গোপন পথের মানচিত্র পেয়ে ইংরাজসেনা সে-রাতেই জলপথ অতিক্রম করে দুর্গপ্রাকারের তলদেশে পৌঁছল। নবাবসেনা তখন সুখনিদ্রায় মগ্ন। যে দু'একজন প্রহরী বাইরে পাহারা দিচ্ছিল, ইংরাজসেনা তাদের হত্যা করে পাঁচিল বেয়ে ভেতরে ঢুকে দুর্গদ্বার খুলে দিল।

*　　　　*　　　　*

মুঙ্গের দুর্গে নিজেদের কক্ষে বসে শেঠেরা অধীর আগ্রহে মুহূর্ত্ত গুণছেন।

জগৎশেঠ : রাত ভোর হতে আর দেরী নেই! ইংরাজ নিশ্চয়ই এতক্ষণে উধুয়ানালা জয় করেছে।

স্বরূপচাঁদ : আমারও তাই বিশ্বাস।

রাজবল্লভ : এ সময় এখানে না বসে, মন্ত্রণাকক্ষে নবাবের কাছে যাই চল। তাহলে নবাব আর আমাদের সন্দেহ করবেন না।

জগৎশেঠ : ঠিক বলেছ। চল হে, নবাবের কাছে যাই। জয় শিবশঙ্কর!

স্বরূপচাঁদ : আমার বিশ্বাস উধুয়ানালার পরাজয়-বার্ত্তা নিয়ে এতক্ষণে নবাবের দূত এসে গেছে।

উধুয়ানালার পরাজয় বার্ত্তা নিয়ে সেই গভীর রাতে সত্যিই একজন এসেছিলেন। তিনি নবাবের দূত নন। নবাব মীরকাশেমের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয়ও ছিল না।

নন্দকুমার তখন মন্ত্রণাকক্ষের এককোণে দ্রুত পায়চারি

করছিলেন। প্রহরী কুর্ণিশ করে বললে: নবাব এক্ষুণি আসছেন হুজুর।

পরক্ষণেই জগৎশেঠ, স্বরূপচাঁদ ও রাজবল্লভ প্রবেশ করলেন। নন্দকুমারকে চিনতে তাঁদের দেরী হল না। জগৎশেঠ বিস্মিতস্বরে বললেন: কে, নন্দকুমার! সুখবর দিন। বলুন আমাদের জয় হয়েছে।

নন্দকুমার ম্লানস্বরে বললেন: না। আমরা পরাজিত। শ্রেষ্ঠী জগৎশেঠ মহতাবচাঁদ! ইংরাজ উধুয়ানালার দুর্গ অধিকার করেছে। আজ রাতেই তারা মুঙ্গের আক্রমণ করবে।

—জয় বাবা বিশ্বনাথ! জয় শিবশঙ্কর!

শেঠেরা যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে হর্ষধ্বনি করে উঠেন।

নন্দকুমার একমুহূর্ত্ত তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—আপনাদের হিংস্র উল্লাস দেখে, পলাশীর কথাই বার বার মনে পড়ছে আমার। শ্রেষ্ঠী জগৎশেঠ মহতাব চাঁদ! ভগবান করুন, আপনাদের সুবুদ্ধির উদয় হোক। বাংলা বিহার উড়িষ্যার স্বাধীন মসনদের শেষ আলোকবর্ত্তিকা নবাব মীরকাশেমের জীবন রক্ষা করুন!

জগৎশেঠ: বটেই ত', আপনি না নবাব মীরজাফরের ভাবী দেওয়ান! যাঁর নিমক খাচ্ছেন, তাঁর বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করতে চান? সর্ব্বনাশ সাধন করবেন মীরজাফরের?

নন্দকুমার: যদি তাই হয়, হোক। এ পোড়া দেশে হাজার হাজার মীরজাফর আছে। কিন্তু মীরকাশেম শুধু একজন।

ইংরাজের হাত থেকে আপনারা তাঁর জীবন রক্ষা করুন শ্রেষ্ঠী জগৎশেঠ মহতাব চাঁদ!

দরজায় নবাব মীরকাশেম। বিষাদগম্ভীর তাঁর মুখ-মণ্ডল। শেঠেরা ও নন্দকুমার কুর্ণিশ করেন। এগিয়ে এলেন নবাব। বললেন: এত রাতে আপনারা এখানে?

জগৎশেঠ: ঘরে থাকতে পারলাম না জাঁহাপনা! আমাদের বিজয়বার্তা শুনবার জন্য অধীর আগ্রহে ছুটে এলাম।

নবাব: তা ত' আসবেনই। আপনারা আমার পরম সুহৃদ। দোস্ত। ইনি কে?

জগৎশেঠ: ইংরাজের উপদেষ্টা, মীরজাফরের ভাবী দেওয়ান নন্দকুমার। উধুয়ানালার পরাজয়-বার্তা নিয়ে এসেছেন হজরৎ! কিন্তু আমরা বিশ্বাস করিনি।

রাজবল্লভ: হজরৎ! লাখো টাকার লোভে বেইমান হজরতকে ইংরাজের হাতে ধরিয়ে দিতে চায়। হাতে ওর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা।

নবাব নন্দকুমারের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন: আপনিই নন্দকুমার!

নন্দকুমার: হজরৎ! সত্যিই আমি পরাজয়-বার্তা নিয়ে এসেছি। আমার দুর্ভাগ্য।

জগৎশেঠ: বিশ্বাস করবেন না হজরৎ! বেইমানকে বিশ্বাস করবেন না।

নবাব : না। বেইমানদের আর বিশ্বাস করব না। বড্ড ঠকে গেছি এবার…

নন্দকুমার : জাঁহাপনা! গোস্তাকি মাফ করবেন। এই মুহূর্ত্তেই নবাবের দুর্গ ত্যাগ করা উচিত।

জগৎশেঠ : হজরৎ! বেইমানকে আদৌ বিশ্বাস করবেন না। যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করবই।

নবাব : নন্দকুমার ইংরাজের দোস্ত নয়, নবাবের দোস্ত। দেশের জনসাধারণের পরম বন্ধু। শুধু আজ বলে নয়, ইংরাজের গতিবিধির গোপন খবর নন্দকুমার বরাবরই আমাকে জানিয়ে দিয়ে সাবধান করেছেন। সত্যিকার দোস্ত বলেই নন্দকুমার আজ নিজের জীবন বিপন্ন করে এখানে এসেছেন আমাকে সাবধান করে দিতে।

জগৎশেঠ : হজরৎ!

নবাব : বেইমান নন্দকুমার নন্, বেইমান তোমরা! তোমাদের ষড়যন্ত্রেই আজ আমি উধুয়ানালায় পরাজিত।

স্বরূপচাঁদ : আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি হজরৎ।

নবাব : জগৎশেঠ মহতাবচাঁদ! কোথায় আমার পাঞ্জা! গঙ্গা-স্নানের জন্য তোমাদের যে পাঞ্জা দিয়েছিলাম কোথায় সেই পাঞ্জা? শেঠেদের মুখে এবার আর প্রতিবাদের ভাষা যোগাল না। নবাব বলতে লাগলেন : তোমাদেরই দূত উধুয়ানালায় গোপন পথের মানচিত্র নিয়ে, সেই পাঞ্জার সাহায্যে দুর্গ থেকে বেরিয়ে ইংরাজশিবিরে ছুটে যায়নি? বেইমান!

নবাব নন্দকুমারের দিকে তাকালেন।

—দোস্ত! আজ নবাবী তক্ত ছেড়ে দুনিয়ার পথে ফকিরী নিয়ে বেরোবার আগে জাফর আলির ভাবী দেওয়ানের পদে তোমাকে দেখে অন্ততঃ এটুকু সান্ত্বনা পাচ্ছি, ইংরাজের কাছে তুমি আত্মবিক্রয় করবে না। বিদায় বন্ধু!

নন্দকুমার কুর্নিশ করে বিদায় নিলেন।

জগৎশেঠ : জাঁহাপনা! এবার আমাদেরও মুক্তি দিন।

মুক্তি! নবাব হো হো করে হেসে উঠলেন। যেন এতবড় রসিকতা আর কখনো শোনেন নি। হাসি থামলে বললেন : মানুষের ঘৃণা আর অবজ্ঞা কুড়িয়ে যুগ যুগ অনন্তকাল ধরে চলবে যাদের বিচার, তারাও আজ মুক্তি চায়! হা হা হা!

হাসতে হাসতে নবাব জানালায় সরে এলেন। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আকাশে একটাও তারা চোখে পড়ে না। নীচে, ফেনিল উচ্ছ্বাসে কলকল শব্দে ভাগীরথী ছুটে চলেছে।

নবাব ফিরে তাকালেন শেঠেদের দিকে।

—তাহলে তোমরা সত্যিই মুক্তি চাও?

জগৎশেঠ : শেঠেরা কারো তামাসার পাত্র নয় হজরৎ! আর একথাও ঠিক, দু'ঘণ্টা আগে কি পিছে আমরা মুক্তি পাবই।

নিশ্চয়ই!···নবাব চেঁচিয়ে ডাকেন : সমরু! মার্কার!

এগিয়ে এল সেনাপতিরা। নবাব বলতে লাগলেন : এরা মুক্তি চাইছে। মুক্তি দাও এদের। হা হা হা!

সমরু ও মার্কার বন্দুকের সঙ্গীন দিয়ে শেঠেদের আক্রমণ করে। শেঠেরা প্রাণভয়ে আর্ত্তনাদ করে উঠল। নবাব হাসতে হাসতে মন্ত্রণাকক্ষ পরিত্যাগ করেন।

সমরু ও মার্কার শেঠেদের নির্ম্মমভাবে হত্যা করে জানালা দিয়ে নীচে ফেলে দিল।

পরক্ষণেই রাত্রির অন্ধকারে তিনটি মৃতদেহ গঙ্গার ঘূর্ণ্যাবর্ত্তে অতলে তলিয়ে গেল।

শেঠেরা রইলেন না। রইল শুধু তাঁদের অখ্যাতি অপযশ।



মন্দির-প্রাঙ্গণে

মরা চাঁদের ফিকে জোছনায় দিগন্ত ম্লান শোকাচ্ছন্ন মনে হয়। সেই ম্লানিমার ঢেউ লেগেছে শান্ত নদীর জলে, অচঞ্চল গাছের পাতায়।

অনেক রাত। গঙ্গাতীরে বসে সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ গাইছেন।

অদূরে মন্দির-প্রাঙ্গণে বসে নন্দকুমার পণ্ডিত জগন্নাথ তর্ক পঞ্চাননের সঙ্গে ভগবৎতত্ত্ব আলোচনায় মশগুল। রামপ্রসাদের গান শুনে নন্দকুমার স্থির থাকতে পারেন না। তত্ত্ব আলোচনা বন্ধ রেখে ছুটে এলেন রামপ্রসাদের পাশে।

রামপ্রসাদের সুরে সুর মিলিয়ে তিনিও গাইতে লাগলেন। দু'জনেরই চোখের কোণ বেয়ে অশ্রুধারা ছুটল।

গান শেষ হলে জগন্নাথ নন্দকুমারকে বললেন: আপনার সঙ্গে ক'দিন শাস্ত্র আলোচনা করে আমার এই ধারণা জন্মেছিল, আপনি রাজনীতির মতই ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। এখন দেখছি আপনি শুধু পণ্ডিত নন, গায়কও বটে।

রামপ্রসাদ বললেন: নন্দকুমার মার শ্রেষ্ঠ ভক্ত। মাকে যে ভালবাসে তার গলা আপনি খুলে যায়। জানেন তর্ক পঞ্চানন মশাই, নন্দকুমার নিজে অনেকগুলো শ্যামা-সঙ্গীতও রচনা করেছেন।

জগন্নাথ বিস্মিতস্বরে বললেন ঃ উনি গানও রচনা করেন, বলেন কি !

নন্দকুমার স্মিতমুখে বললেন ঃ সে-সব রামপ্রসাদের অনুকরণ ছাড়া কিছু নয়।

জগন্নাথ ঃ কিন্তু একটা কথা ভেবে আমি অবাক্ হয়ে যাই। আপনি নবাবের রাজ্যের কর্ণধার, মুর্শিদাবাদের দেওয়ান। রাজ্য-চালনার সমস্ত দায়িত্ব বহন করেও আপনি শাস্ত্রালোচনা করেন—সঙ্গীত রচনা করেন। এত সময় আপনি কোথায় পান ?

নন্দকুমার হাসতে লাগলেন।

—শুধু তাই নয়। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সঙ্গে দু'দণ্ড বসে গল্প করবারও সময়ের অভাব হয় না আপনার !

রামপ্রসাদ ঃ ওর কথা ছেড়ে দিন। আশ্চর্য্য ক্ষমতা নিয়ে ও জন্মেছে।

তারপর নন্দকুমারের দিকে ফিরে বললেন ঃ বাপুদেব শাস্ত্রীর খবর কি নন্দকুমার ? প্রমদাই বা কোথায় ?

নন্দকুমার ঃ গুরুদেব কাশীবাস করছেন। দেশে ফিরবার আর ইচ্ছা নেই। প্রমদা এতদিন শ্বশুরবাড়ী ছিল। কিছুকাল হল সেও কাশীবাসিনী হয়েছে।

জগন্নাথ ঃ বেচারা! শুনেছিলাম আপনি নাকি প্রমদার জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন ?

নন্দকুমার: তা' করেছিলাম। শেঠ বুলাকীদাসের সঙ্গে ব্যবস্থা করেছিলাম জহরৎ বেচে যে টাকাটা তিনি সুদী কারবারে খাটাবেন, তার মুনাফা থেকে প্রমদাকে কিছু কিছু মাসোহারা পাঠাবার জন্য। শেঠ বুলাকীদাস মীরকাশেমের পক্ষে ছিলেন বলে, ইংরাজ তাঁর ধনরত্ন সব লুঠ করে নেয়। সুতরাং মাসোহারার ব্যবস্থা ঐখানেই বন্ধ হল।

রামপ্রসাদ: বুলাকীদাসের অবস্থা এখন খুবই শোচনীয়। সেদিন মন্দিরে এসেছিলেন। দেখলাম, একদম ভেঙ্গে পড়েছেন। কাজ-কারবার বলতে কিছুই নেই। খুবই আর্থিক অনটনে দিন কাটছে।

নন্দকুমার: আমি জানি।

জগন্নাথ বললেন: রাত অনেক হল। এবার বাড়ী ফেরা যাক।

নন্দকুমার: আর একটু বসুন। রামপ্রসাদ ভাই, আর একখানি গাও। কাল রাজধানীতে ফিরে যাচ্ছি। কতগুলো জরুরী কাজ মাথার উপর রয়েছে। এবার হুগলীতে ফিরতে দেরী হবে।



দেওয়ান নন্দকুমার

উদ্দাম অশান্ত স্রোতস্বতী স্থির শান্ত হয়ে আসে। যুদ্ধ-বিগ্রহ এখন বন্ধ। ভাগ্যলক্ষ্মী কোম্পানীর গলায় আর একবার বিজয়-মাল্য পরিয়ে দিলেন।

একটির পর একটি যুদ্ধে পরাজিত, বিধ্বস্ত হয়ে নবাব মীরকাশেম শেষ পর্য্যন্ত দুনিয়ার পথে আত্মগোপন করলেন।

মীরজাফর তক্ত মোবারকে বসলেন। নন্দকুমার তাঁর দেওয়ান। ইংরাজ ফিরিঙ্গির সম্বন্ধে মীরজাফরের সেই গদগদ ভাব আর নেই। অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জেনেছিলেন, প্রয়োজন হলে কোম্পানী তাঁর সঙ্গে আবার বেইমানি করবে। তাই দেওয়ান নন্দকুমার যখন কোম্পানীর দুর্নীতিপরায়ণ কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে দৃঢ় মনোভাব প্রকাশ করলেন, নবাব বাধা দিলেন না। বরং তিনি নন্দকুমারের উপর রাজকার্য্যের সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে আরামের নিঃশ্বাস মোচন করলেন। নন্দকুমার বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য। মীরজাফর জানেন, নন্দকুমার যা করবেন, তা নবাবের ভালর জন্যই। নন্দকুমারের যোগ্যতা ও সততার উপর অগাধ বিশ্বাস তাঁর।

নন্দকুমার রাজস্ব সংগ্রহ করে কোম্পানীর পাওনা মিটিয়ে দিলেন। নবাবের শুল্ক, রাজস্ব ও অন্যান্য বিভাগ থেকে দুর্নীতি-পরায়ণ কর্ম্মচারীদের ছাঁটাই করে, সে-সব জায়গায় যোগ্য ব্যক্তি নিয়োগ করলেন নন্দকুমার।

হুগলী বন্দর। নবাবের শুল্ক অফিসারদের নিকট আজকাল

আর সাদাকালো ভেদাভেদ নেই। নবাবের শুল্ক ফাঁকি দিয়ে কারো নিস্তার নেই—তা' তিনি ইংরাজ বণিক হোন, আর দেশীয় বণিক হন।

সেদিনও ইংরাজ গোমস্তারা কোম্পানীর নিশান উড়িয়ে বিনা শুল্কে অবাধ বাণিজ্য করে ঘুরে বেড়িয়েছে। তাই আজ হঠাৎ নবাবের সিপাই আসতে দেখে ওরা অবাক্ হয়ে যায়। নবাবের সিপাই শুল্ক অনাদায়ে ইংরাজ ফিরিঙ্গিদেরও বন্দী করতে দ্বিধা করে না। যতক্ষণ না শুল্ক আদায় হয়, আটক করে রাখে তাদের।

ফিরিঙ্গিরা লম্ফঝম্প করে। বলে ঃ হামিলোগ কোম্পানীর কাছে নালিশ করিবে। তোমার নকরি যাইবে। শুল্ক বিভাগীয় অফিসার এখন আর জুজুর ভয়ে ভীত নন। বলেন ঃ ভুল করছ সাহেব! হ্যাঁ, একদিন ছিল কোম্পানীর অত্যাচারের ভয়ে তোমাদের কাছ থেকে শুল্ক আদায় করবার সাহস আমাদের ছিল না। কিন্তু সে যুগ চলে গেছে। দেওয়ান নন্দকুমারের আমল কিনা!

সত্যই দেওয়ান নন্দকুমার নবাবের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। নবাবের স্বার্থহানি করে তিনি ইংরাজ ব্যবসায়ীদের মুনাফা বৃদ্ধির পথ সুগম করে দিতে অস্বীকার করলেন। নন্দকুমার ভাল করেই জানেন, ইংরাজ প্রভুরা তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হবেন; কিন্তু ইংরাজের রক্তচক্ষুকে তিনি ভয় করেননি।

গোলাগঞ্জের হাট থেকে সাধারণতঃ সৈন্যবিভাগের যাবতীয় রসদ কেনা হয়। সেবারে ইংরাজ কর্ম্মচারীরা গোলাগঞ্জের হাটে এসে ধান-চাল সব কিনে নিলে। উদ্দেশ্য, সেই সব ধান-চাল চড়া দামে নবাবের কর্ম্মচারীদের নিকট বিক্রী করে দু'-পয়সা মুনাফা করা। দেওয়ান নন্দকুমার কড়া হুকুম দিলেন, ভবিষ্যতে ইংরাজ গোমস্তাদের যেন গোলাগঞ্জের হাটে কেনা-বেচা করতে না দেওয়া হয়। যারা রাজাজ্ঞা অমান্য করবে, তাদের আটকে রাখবে।

গ্রামের লোকেদের কাছে জোর-জবরদস্তি করে চড়াদামে তামাক ও সুপারি বেচে মুনাফা করা সেকালে ইংরাজ গোমস্তা-দের একটা প্রধান ব্যবসা ছিল। যারা তাদের নির্দ্ধারিত চড়াদাম দিতে অস্বীকার করত, তাদের উপর চলত জোর-জুলুম, অত্যাচার। তাই প্রাণভয়ে, দরিদ্র গ্রামবাসীরা ঐ-দামেই গোমস্তাদের কাছ থেকে তামাক ও সুপারি কিনতে বাধ্য হত! এমন কি এ দুই বস্তুতে যাদের আসক্তি নেই, তাদেরও অব্যাহতি ছিল না। এ ছাড়াও আরো নানাভাবে জনসাধারণ ইংরাজ গোমস্তার হাতে নিপীড়িত হত। নন্দকুমার কোম্পানীর নিকট কড়া চিঠি লিখলেন—তাঁরা যেন অবিলম্বে গোমস্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

দেওয়ান নন্দকুমার এগারো দফার এক নালিশ জানালেন কোম্পানীর কাছে। চিঠি পড়ে ত' কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তারা রেগেই খুন। কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে এভাবে খোলা-

খুলি পত্রাঘাত! আস্পর্দ্ধা ত' কম নয়! কই, নবাব মীরজাফর ত' আগে এমন ছিলেন না।

—অন্ততঃ জাফর আলির একথা জানা উচিত, কোম্পানীর স্বার্থের বিরুদ্ধে যে নবাব কাজ করিবে, তাহাকে গদীতে রাখা যাইবে না।

নবকৃষ্ণ সেদিনকার সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন: কোম্পানীর বিরুদ্ধাচরণ নবাব জাফর আলি কোনদিন করেন নি। আজো তাঁর সে সাহস, সে শক্তি নেই। ঐ দেওয়ান নন্দকুমারই যত নষ্টের গোড়া।

ভ্যান্সিটার্ট: হাপনি কি বলিতে চান?

—নবাব নিজে কিছু দেখেন না হুজুর। রাজকার্য্যের সব দায়িত্ব নন্দকুমারের উপর।

ভ্যান্সিটার্ট: সেই ইংরাজ বিদ্বেষী নন্‌কুমার! কোম্পানীর নিকট সে সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ চাহে!

একজন কাউন্সিলার বললেন: নন্‌কুমারকে দেওয়ানী হইতে বরখাস্ত করা উচিত।

Certainly. নায়েব-সুবা মহম্মদ রেজা খান্ কোম্পানীর বন্ধু! আমি তাহাকে দেওয়ানী গদিতে বসাইব।

ভ্যান্সিটার্ট বললেন: But my friends! এই বিষয়ে হামি নবাব জাফর আলির সঙ্গে ঝগড়া করিতে চাহি না। মহম্মদ রেজা খান্‌কে দেওয়ানী গদীর জন্য আরো কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে।

ঢাকার নবাব-সুবা মহম্মদ রেজা খান্ নবাবের খাজাঞ্চি-খানা থেকে কুড়িলক্ষ টাকা তছরূপ করবার অভিযোগে পদচ্যুত হন। দেওয়ান নন্দকুমার নবাবের অর্থ ফিরিয়ে দেবার জন্য মহম্মদ রেজা খান্‌কে অনুরোধ করে দূত পাঠালেন। কিন্তু রেজা খান্ সে অনুরোধ রাখলেন না। নবাব তাঁকে মুর্শিদাবাদে ডেকে পাঠালেন। কোম্পানীর আশ্রিত মহম্মদ রেজা খান্ বুক ফুলিয়ে রাজধানীতে এসে পৌঁছলেন। সেদিন দরবার-কক্ষে তিনি দেওয়ান নন্দকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। নন্দকুমারের অপরিসীম ক্ষমতা মহম্মদ রেজা খান্‌কে ঈর্ষ্যান্বিত করে তুলল। মহম্মদ রেজা খান্! নন্দকুমার বলতে লাগলেন: নবাবের রাজকোষ থেকে আপনি কুড়িলক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন, একথা কি অস্বীকার করতে চান? ভুলে যাবেন না, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় দলিল-পত্র ও তথ্যাদি নবাব সংগ্রহ করেছেন।

মহম্মদ রেজা খান্ উদ্ধত স্বরে বললেন: দেওয়ান নন্দকুমার! মানী ব্যক্তিদের সম্মান রেখে কথা বলতে হয়।

নন্দকুমার: মহম্মদ রেজা খান্! আপনি কি বুঝতে পারছেন না, আপনার পদমর্য্যাদা বিবেচনা করেই, এখনো আপনাকে কয়েদ করা হয়নি? নিজের সম্মান নিজে রাখতে হয়। নবাবের টাকা যথাসময়ে ফিরিয়ে দিলে এসব কথাও উঠত না।

মহম্মদ রেজা খান্: টাকা আমি ফেরত দিতে পারব না।

ব্যস্, আমার এক কথা। মনে রাখবেন আমার উপর জোর-জুলুম করলে কোম্পানীর কাছে নালিশ করতে বাধ্য হব।

নন্দকুমার ঃ ভয় দেখাচ্ছেন ?

মহম্মদ রেজা খান্ ঃ মনে করতে পারেন !

নন্দকুমার ঃ বেশ ! আপাততঃ নবাবের হুকুমে আমি আপনাকে বন্দী করলাম। এই, কে আছিস্ !

দুজন সশস্ত্র প্রহরী এগিয়ে এল। মহম্মদ রেজা খান্ চমকে উঠলেন। তবে কি সত্যি-সত্যিই এরা তাঁকে বন্দী করবে ?

দেওয়ান নন্দকুমার !···রেজা খান্ এবার নরম সুরে বললেন ঃ সামান্য কুড়িলক্ষ টাকার জন্য আপনি আমায় বন্দী করবেন ?

নন্দকুমার ঃ কেন ভাবছেন মহম্মদ রেজা খান ! কোম্পানী আপনার বন্ধু। তাঁরা নিশ্চয়ই আপনার মুক্তির ব্যবস্থা করবেন।

মহম্মদ রেজা খান্ ঃ দেওয়ান নন্দকুমার ! কথা দিচ্ছি, সাত দিনের ভেতর নবাবের সব টাকা আমি শোধ করব।

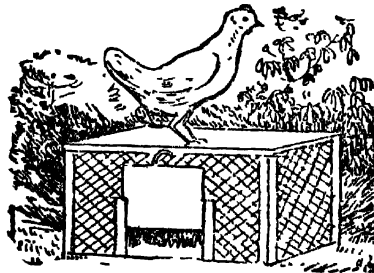
নন্দকুমার ঃ আপনি সম্মানিত ব্যক্তি। আপনার মুখের কথায় আমি বিশ্বাস করলাম। আশা করি, আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করবেন। আপনি মুক্ত ! এখন যেতে পারেন।

কিন্তু মহম্মদ রেজা খান্ নবাবের টাকা পরিশোধ করবার চেষ্টাও করলেন না আর। পাছে নবাব তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে জোর-জুলুম করেন, গ্রেপ্তার হবার ভয়ে তিনি ইংরাজ প্রভুদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

কিসে ইংরাজ প্রভুরা সন্তুষ্ট হন সেদিকে মহম্মদ

রেজা খানের লক্ষ্য আছে। মহম্মদ রেজা খান্ দেওয়ানী গদীতে বসলে কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের বে-আইনি কাজ কারবারের সুবিধা হবে, সুগম হবে মুনাফাবৃদ্ধির পথ। তা ছাড়া তিনি মোটা টাকা ঘুষ দেবেন ইংরাজ প্রভুদের।

কিন্তু এখন কোন্ ছুতোয় নন্দকুমারকে পদচ্যুত করা যায়? দেওয়ান নন্দকুমার ইতিমধ্যে কোম্পানীর পাওনা-গণ্ডা সব মিটিয়ে দিয়েছেন। তা ছাড়া তাঁর শাসনে দেশের সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। নবাব মীরজাফরের প্রিয় পাত্র নন্দকুমার; কোম্পানী তাঁকে বরখাস্ত করতে চাইলেই যে নবাব সে অনুরোধ মেনে নেবেন, তা মনে হয় না। এ সময় নবাবের সঙ্গে অকারণে কলহে প্রবৃত্ত হওয়ার পক্ষে কোম্পানীর বড়কর্ত্তাদের আগ্রহ ছিল না। তাই কলিকাতা কাউন্সিলের সভ্যরা বৃদ্ধ অসুস্থ নবাব মীরজাফরের মৃত্যু-সংবাদের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।



মহারাজ নন্দকুমার

দিল্লীশ্বর শা-আলমের উজির অযোধ্যার অধিপতি সুজাদ্দৌল্লার দরবারে নন্দকুমারের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। নন্দকুমার নবাব মীরজাফরের জন্য দিল্লীশ্বরের সনন্দ সংগ্রহ করতে সুজাদ্দৌল্লার নিকট দূত পাঠালেন।

দিল্লীশ্বর নবাব মীরজাফরের জন্য সুবেদারী সনন্দ ত' পাঠালেনই, উপরন্তু তিনি দেওয়ান নন্দকুমারকে মহারাজা উপাধি ও সাত হাজার সৈন্যের আধিপত্য বা মনসবদারী দান করলেন। নন্দকুমারের এই কূটনৈতিক চালে কোম্পানীর ইংরাজ প্রভুরা বিশেষ বিরক্ত হলেন। কোম্পানীর সঙ্গে পরামর্শ না করে, নবাব সনন্দের জন্য দিল্লীশ্বরের নিকট আবেদন করলেন কোন সাহসে? সে যাই হোক, নবাব মীরজাফরের সুবেদারী সনন্দ প্রাপ্তিতে ইংরাজ হয়ত তেমন অসন্তুষ্ট হত না, যদি ঐ সঙ্গে নন্দকুমার মহারাজা উপাধি না পেতেন। সেই ইংরাজ-বিদ্বেষী নন্দকুমার—যিনি কোম্পানীর বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, যিনি আজো কোম্পানীর মুনাফা বৃদ্ধির পথে প্রধান অন্তরায়—তিনিই কি না মহারাজ সনন্দ লাভ করলেন!

দেওয়ান নন্দকুমার প্রতিবন্ধক না হলে নানা ছলছুতো করে তারা নবাব মীরজাফরকে আরো শোষণ করত। দিনের পর দিন দেওয়ান নন্দকুমারের নামে কোম্পানীর কাছে নালিশ আসে—নন্দকুমার কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের পথের

কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মুর্শিদাবাদের দেওয়ানী গদী থেকে সরিয়ে নাও নন্দকুমারকে।

কিন্তু দেওয়ান নন্দকুমার কোম্পানীর নিকট যতই না কেন দোষী বলে বিবেচিত হোন, তিনি তাঁর অধিকারের বাইরে কোথাও যাননি। একজন কর্ত্তব্যপরায়ণ ন্যায়নিষ্ঠ দেওয়ান হিসাবেই তিনি নবাবের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য ইংরাজ কর্ম্মচারী-দের বাধা দিচ্ছিলেন।

কোম্পানী যখন নন্দকুমারকে দেওয়ানী থেকে বরখাস্ত করবার জন্য ছুতো খুঁজছিলেন, এমনি সময় দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক 'মহারাজা' সনন্দ প্রদানের সংবাদ, কোম্পানীর বুকে ঈর্ষ্যার আগুন জ্বালিয়ে দিলে। মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট্ মিড্লটন্ কলকাতায় চিঠি লিখলেন, দিল্লীশ্বর সনন্দে দেওয়ান নন্দকুমারের কার্য্যাবলীর অজস্র প্রশংসা করেছেন! শুধু কি তাই! নবাবকে সনন্দ প্রদানের পূর্ব্বেই নন্দকুমারকে সনন্দ প্রদান করা হয়েছে।

নন্দকুমারের সনন্দ প্রাপ্তিতে ইংরাজ ছাড়াও রাজা নব-কৃষ্ণ প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি ঈর্ষ্যান্বিত হয়েছিলেন। এঁরা সবাই কোম্পানীর আশ্রিত, ইংরাজ প্রভুদের পেয়ারের লোক। কিন্তু রাজধানীর হিন্দু-মুসলমান আমীর-ওমরাহ ও দেশের জন-সাধারণ নন্দকুমারকে অভিনন্দিত করেছিলেন। সবচেয়ে আনন্দিত হয়েছিলেন নবাব নিজে। নন্দকুমারের উপর নবাবের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল অপরিসীম।

শেঠ বুলাকী দাসের অঙ্গীকার-পত্র

সেদিন ঠাকুরদালানে বসে মহারাজ নন্দকুমার সঙ্গীত রচনা করছিলেন ; পুত্র গুরুদাস এসে বললেন : বাবা ! শেঠ বুলাকী-দাসের বাড়ী থেকে একজন লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

মহারাজ : কি নাম বললেন ?

—পদ্মমোহন।

মহারাজ : পদ্মমোহন বুলাকীদাসের ভাইপো। এখানে পাঠিয়ে দাও।

পরক্ষণেই পদ্মমোহন এসে নন্দকুমারকে প্রণাম করলে।

মহারাজ : বস।

পদ্মমোহন নন্দকুমারের মুখোমুখি আসন পরিগ্রহ করলে তিনি বললেন : শেঠ বুলাকীদাসের শরীর কেমন আছে ?

—ভাল নয় মহারাজ। এ যাত্রা সেরে উঠবার কোন সম্ভাবনা দেখছি নে।

—বয়সও ত' হয়েছে।

পদ্মমোহন : তা ত' হয়েছেই। কাকা আপনার দর্শন-লাভের জন্য বড় অধৈর্য্য হয়ে পড়েছেন।

মহারাজ : কিন্তু আমার সময় কোথায় বল ত' ! হ্যাঁ, জহরতের টাকাগুলোর কিছু ব্যবস্থা হল ?

পদ্মমোহন : আজ্ঞে না। কাকার বর্তমান আর্থিক অবস্থার কথা মহারাজ জানেন। এতগুলো নগদ টাকা বার করা তাঁর পক্ষে বর্তমানে অসম্ভব বললেই চলে।

নন্দকুমার : নগদ দিতে অসুবিধে হয় ত', অন্য ব্যবস্থা করুন। তোমরা ত' জান ঐ টাকার মালিক গুরুকন্যা প্রমদা। বিধবার টাকা ত' আমি ছেড়ে দিতে পারিনে।

পদ্মমোহন : তা ত' বটেই। টাকা পরিশোধ করবার একটা মাত্র পথ খোলা আছে, অবশ্য মহারাজ যদি রাজী হন।

নন্দকুমার : অর্থাৎ কোম্পানীর কাছে বুলাকীদাসের যে আড়াই লাখ টাকা পাওনা আছে তা আদায় করে আমার টাকা বুঝে নেওয়া। এই কথা ত'?

পদ্মমোহন : হুজুর সবই জানেন। এ প্রস্তাবে মহারাজকে রাজী হতেই হবে। হুজুরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করবার জন্য কাকা আমাকে বলে দিয়েছেন।

—দেখো পদ্মমোহন, ঐ সব ঝামেলায় আমি যেতে চাইনে। এমনিতেই কোম্পানীর সঙ্গে আমার সদ্ভাব নেই।

—হুজুর! শেঠ বুলাকীদাস চিরকালই আপনার স্নেহ ও অনুগ্রহ পেয়ে এসেছেন। আজ মরবার আগে আপনি যদি তাঁকে দয়া করে ঋণমুক্ত না করেন, তিনি শান্তিতে মরতে পারবেন না। তা ছাড়া, এতে আমাদেরও স্বার্থ জড়িত।

—কেমন করে?

—আপনি একটু চেষ্টা করলে কোম্পানীর নিকট থেকে

টাকা আদায় হবেই হবে। আপনার পাওনা মিটিয়ে দিয়ে বাকী যা থাকবে, তাতে আমরা খেয়ে বেঁচে থাকব।

—বেশ। তাই হবে। শেঠ বুলাকীদাসকে বল, তিনি যেন দলিল তৈরী করে রাখেন।

শেঠ বুলাকীদাস মহারাজ নন্দকুমারকে আপন গুরুদেবের মতই ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। নন্দকুমার তাঁর প্রস্তাবে রাজী হয়েছেন শুনে তিনি আনন্দিত হলেন।

আমি জানতাম, আপনি আমায় শেষ দর্শন নিশ্চয়ই দেবেন। রোগশয্যা থেকে বুলাকীদাস বললেন। তারপর পদ্মমোহন, গঙ্গাবিষ্ণু ও অন্যান্য পরিবার-পরিজনদিগকে ইসারায় দেখিয়ে বললেনঃ মহারাজ! আমার সময় হয়ে এসেছে। আমি চললাম। এরা সব আমার ওয়ারিশ। আমারই মত এরা যেন আপনার স্নেহ থেকে বঞ্চিত না হয়।

নন্দকুমার আশ্বাস দিলে বললেনঃ তাই হবে বুলাকীদাস।

বুলাকীদাস তাঁর উকিল শীলাবতের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ দলিল হল শীলাবত ?

হ্যাঁ, শেঠজী।···শীলাবত বললে।

—একবার পড় দেখি ?

শীলাবত পড়তে লাগল।

আমি বুলাকীদাস, একছড়া মুক্তার হার, একখানি কল্কা, একটি শিরপেঁচ, চারটি আংটী—দুটি হীরের, দুটি মাণিকের, রঘুনাথ জীউ নন্দকুমার বাহাদুরের পক্ষ হইয়া বিক্রয়ের জন্য

গচ্ছিত রাখি। নবাব মীর মহম্মদ কাশেম আলি খাঁর সৈন্যের পরাজয়ের পর উপরি উক্ত মহারাজ, পূর্ব্বকথিত গচ্ছিত জহরৎ আমার নিকট দাবী করেন। আমার অবস্থা ভাল না হওয়াতে জহরৎ ফিরাইয়া দিতে বা তাহার মুল্য দিতে অক্ষম হই। আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, কিঞ্চিদধিক আড়াই লক্ষ টাকা যাহা আমার কোম্পানীর নিকট পাওনা আছে, সেই টাকা প্রাপ্ত হইলেই, আটচল্লিশ হাজার একুশ সিক্কা টাকা জহরতের মুল্য, যাহা আমার কাছে পাওনা আছে, সেই টাকার সহিত টাকা প্রতি চারি-আনা হারে সুদ-সহ মহারাজকে দিব। এ-বিষয় আমি মহারাজের কোন ওজর আপত্তি শুনিব না। সন ১১৭২ সালের ৭ই ভাদ্র লিখিত হইল। ইতি—

আলাব বুলাকীদাস।

বুলাকীদাস মহারাজের দিকে তাকালেন, বললেন: ঠিক আছে মহারাজ ?

হ্যাঁ ঠিকই আছে।—নন্দকুমার বললেন।

বুলাকীদাস তখন সাক্ষীদের ডাকলেন: মহতাব রায়। কমল মহম্মদ ! শীলমোহর দাও।

দুজন সাক্ষীর শীলমোহর দেওয়া হলে, বুলাকীদাস বললেন: আর কোন সাক্ষীর প্রয়োজন আছে কি ?

—আর কি দরকার ! নন্দকুমার বললেন: দুজনই যথেষ্ট।

বুলাকীদাস তখন দলিলখানি নন্দকুমারের হাতে দিয়ে বললেন: প্রভু ! কোম্পানীর নিকট থেকে টাকা আদায় করে,

আপনার পাওনা টাকা রেখে বাকী যা থাকবে আমার উইল অনুসারে, আমার ওয়ারিশদের বিলিয়ে দেবেন।

—তাই হবে।

—ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন!

দিন কয়েক বাদে শেঠ বুলাকীদাস মারা গেলেন।

মহারাজ নন্দকুমার কোম্পানীর নিকট থেকে বুলাকীদাসের পাওনা টাকা আদায় করলেন। কোম্পানীর কাগজগুলো তিনি প্রথমেই বুলাকীদাসের বিধবা পত্নীর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। বুলাকীদাসের স্ত্রী পদ্মমোহনকে বললেন: আগে মহারাজের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে এস বাবা। তারপর আমাদের ভেতর ভাগাভাগি করা যাবে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা পদ্মমোহন, গয়াবিষ্ণু ও গয়াবিষ্ণুর আমোক্তার মোহন প্রসাদ কোম্পানীর কাগজ নিয়ে মহারাজের বাড়ীতে গেলেন। নন্দকুমার নিজের পাওনা রেখে বুলাকী-দাসের অঙ্গীকার-পত্রখানি ওদের ফিরিয়ে দিলেন।

গয়াবিষ্ণু!···তিনি বললেন: হিসাবটা ভাল করে দেখেছ ত'?

গয়াবিষ্ণু বললেন: আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ! সব ঠিক আছে। ধর্ম্মসাক্ষী করে বলছি, এ নিয়ে পরে আমাদের ভেতর কেউ কথা তুললে, আমি জবাবদিহি হব।

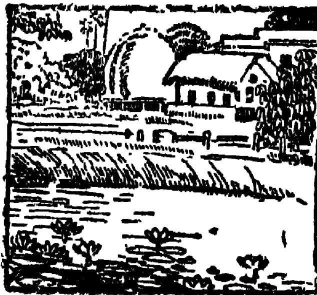
—বেশ বেশ! নন্দকুমার বললেন: তাহলে হিসাবের খাতায় সই কর তোমরা।

মোহন প্রসাদ বললে: আজ্ঞে এই ভর সন্ধ্যাবেলা সইটা নাই বা করলাম! কাল সকালবেলা এসে সই করে দিয়ে যাব'খন।

বেশ ত'।...নন্দকুমার বললেন: তোমাদের এসে কাজ কি? সকালবেলা আমি চৈতন্যনাথকে পাঠিয়ে দেব তোমাদের বাড়ীতে। খাতায় সই করে দিয়ো।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আজ তাহলে এস।





হুজুর। শেঠ বুলাকীদাস চিরকালই আপনার স্নেহ ও অনুগ্রহ পেয়ে এসেছেন। পং—১২৪

কোম্পানীর জুলুমবাজী

নবাব মীর মহম্মদ জাফর আলি খাঁ মহবৎ জঙ্গ বাহাদুর মৃত্যুশয্যায়। পাত্র-মিত্র আমীর-ওমরাহ সবাইকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন। সবার সামনে নবাব তাঁর শেষ ইচ্ছা ব্যক্ত করবেন। অন্দরমহল লোকে ভর্ত্তি। অনেকদিন ধরে নবাব অসুখে ভুগছিলেন। শেষ মুহূর্ত্ত নিকটবর্ত্তী জেনেই নবাব এ ব্যবস্থা করেছেন।

শয্যার উপর নবাব বেহুঁস হয়ে পড়েছিলেন। শয্যার একপাশে মণিবেগম, বব্বু বেগম ও নাজামদ্দৌল্লা, মোবারকদ্দৌল্লা বসে নীরবে কাঁদছিলেন।

নন্দকুমার নবাবকে কিরীটেশ্বরীর পাদোদক খাইয়ে দিলেন। শেষবারের মত নবাব চোখ মেলে তাকালেন। আস্তে আস্তে তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। ঘরের চারপাশে যতখানি সম্ভব ঘাড় বেঁকিয়ে তিনি দেখে নিলেন বারেক।

দোস্ত। নবাব ক্ষীণ স্বরে বলতে লাগলেন; আপনাদের ছেড়ে আমি চললাম। যাবার আগে সবার সামনে ঘোষণা করে যাচ্ছি নাজামদ্দৌল্লা আপনাদের ভাবী নবাব। আর মহারাজ নন্দকুমার আপনাদের ভাবী দেওয়ান। বলুন, আমার ব্যবস্থায় আপনারা সম্মত ?

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে নবাব রীতিমত হাঁপাতে

লাগলেন। হাকিম সরবতের পাত্র মুখের কাছে ধরলেন। কিন্তু নবাব হাতের ইসারায় তাঁকে সরে যেতে বললেন। নন্দকুমার আমীর-ওমরাহদের দিকে তাকালেন। বললেন ঃ

—নবাব আপনাদের মতামত শোনবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত। আপনারা কিছু একটা বলুন।

—আমরা সম্মত হুজুর। আমীরদের একজন প্রধান বললেন ঃ এ ব্যবস্থা ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত। নাজামদ্দৌল্লা আমাদের ভাবী নবাব। মহারাজ নন্দকুমার আমাদের দেওয়ান।

খোদা আপনাদের মঙ্গল করবেন। বলতে বলতে নবাব বালিশের উপর নিস্তেজ হয়ে পড়লেন। সবাই শেষ মুহূর্ত্ত গুণতে লাগল। বেগম ও নবাবজাদারা কাঁদতে সুরু করেছেন।

কিন্তু পরক্ষণেই নবাব আবার চোখ মেলে তাকালেন। রেসিডেণ্ট মিডল্‌টন্‌ পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নবাব ইঙ্গিতে তাঁকে কাছে ডাকলেন।

—সাহেব!

—Yes, Your Excellency!

নবাব ক্ষীণস্বরে বললেন ঃ আমার শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেছি। আশা করি, তুমি শুনতে পেয়েছ?

মিডল্‌টন্‌ ঃ Yes, হজরৎ!

নবাব ঃ কোম্পানীকে জানিয়ে দিয়ো আমার শেষ ইচ্ছায় যেন বাদ না সাধে। আমার হয়ে তুমি তাদের অনুরোধ কর। করবে ত'?

—Yes, Your Excellency !

নবাব এবার মহারাজ নন্দকুমারের দিকে তাকিয়ে বললেন : জীবনে অনেক পাপ করেছি। তার জন্য অনুশোচনাও ভোগ করেছি বিস্তর। কিন্তু খোদার কাছে কি পুণ্য করেছিলাম জানি না, তাই তিনি আপনার মত দরদী বন্ধু জুটিয়ে দিয়েছিলেন।… আপনাদের ছেড়ে যেতে বড় কষ্ট হচ্ছে…বড় কষ্ট…

বলতে বলতে নবাব মীর মহম্মদ জাফর আলি খাঁ অন্তিম নিদ্রায় নিদ্রিত হলেন।

কোম্পানীর ইংরাজ প্রভুরা অধৈর্য্য চিত্তে নবাব মীরজাফরের মৃত্যু সংবাদের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। সংবাদ পৌঁছামাত্রই মহম্মদ রেজা খান্‌কে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা সদলবলে মুর্শিদাবাদ রওয়ানা হলেন।

নবাব মীরজাফরের মৃত্যুতে অবশ্য রাজধানী শোকাচ্ছন্ন হয়ে উঠেনি, নবাব-পরিবার বিশেষ করে তাঁর নাবালক পুত্র-কন্যারাই শোকে ম্রিয়মাণ হয়ে উঠেছিলেন। শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস তখনো কাটেনি। রাজ-অন্তঃপুরে সেদিন মহারাজ নন্দকুমার নবাব নাজামদ্দৌল্লাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন : সংসারে কেউ অমর নয়। পিতৃশোকে কি নবাবের অধীর হলে চলে!

সিপাই কুর্ণিশ করে এসে সামনে দাঁড়াল, বলল : সাহেবেরা আসছেন হুজুর!

এখানে? নাজামদ্দৌল্লা বিরক্তস্বরে বললেন : অনুমতি না নিয়েই তারা অন্তঃপুরে ঢুকেছে? স্পর্দ্ধা ত' কম নয়!

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই মিডল্‌টন্‌ স্পেন্সার ও একজন গোরা সিপাই সঙ্গে করে কক্ষে প্রবেশ করলেন। ঘটনাটা এমনি আকস্মিক যে এক মুহূর্ত্ত কারো মুখে কথা সরল না।

মিডল্‌টন্‌ নাজামদ্দৌল্লাকে দেখিয়ে বললেন ; **This is the boy !**

গবর্ণর স্পেন্সার নাজামদ্দৌল্লার কাছে এগিয়ে এলেন একপা। বললেন ঃ তুমিই নাজামদ্দৌল্লা ? নন্দকুমার উত্তর দিলেন ঃ ইনিই নবাব নাজামদ্দৌল্লা—মুর্শিদাবাদ তক্তের উত্তরাধিকারী।

স্পেন্সার বিরক্তস্বরে বললেন ঃ বটে ? তুমি কে হে ?

মিডল্‌টন্‌ বললেন ঃ ইনি ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান নন্‌কুমার।

স্পেন্সার বললেন ঃ নন্‌কুমার ! **I see.**

নাজামদ্দৌল্লা বিরক্তস্বরে বললেন ঃ এসব কথাবার্ত্তার অর্থ কি মিডল্‌টন্‌ সাহেব ?

মিডল্‌টন্‌ তাঁকে ধমক দিয়ে বললেন ঃ তুমি চুপ কর। তারপর অন্যান্য সবাইর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আপনারা বাহিরে চলিয়া যান। নাজামদ্দৌল্লার সঙ্গে হামিলোগ কুছ গোপন বাট্‌চিট্‌ করিবে !···হ্যাঁ, মহারাজ নন্‌কুমারকেও বাহিরে যাইতে হইবে।

না। নাজামদ্দৌল্লা বললেন ঃ উনি আমার দেওয়ান।

মিডল্‌টন্‌ ঃ নন্‌কুমার তোমার দেওয়ান নহে। তোমার দেওয়ান হামিলোগ নিযুক্ত করিবে।

গবর্ণর স্পেন্সার বললেন: মহারাজ নন্‌কুমার! দয়া করিয়া হাপনি কিছুক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করিবেন কি?

ততক্ষণে আর সবাই বেরিয়ে গেছেন। শুধু নন্দকুমার ও নবাবের কনিষ্ঠতম ভ্রাতা সৈফদ্দৌল্লা দাঁড়িয়ে। কি ভেবে নন্দকুমার বললেন: বেশ, আমি যাচ্ছি।

নাজামদ্দৌল্লা করুণ, অসহায় স্বরে বললেন: আমায় একা ফেলে যাবেন না দেওয়ানজী!

নন্দকুমার তাঁকে অভয় দিলেন: ভয় কি নবাব! আমি বাইরে আছি। মনে রাখবেন, আপনি নবাব।

নন্দকুমার ত' বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু সৈফদ্দৌল্লা কিছুতেই বেরোবে না। মিডল্‌টন্ যখন তাকে হাত ধরে টানতে সুরু করল, সৈফদ্দৌল্লা কাঁদতে লাগল: না না, আমি যাব না। ভাইজানকে একা ফেলে আমি যাব না। কিন্তু মিডল্‌টন্ তাকে হিড় হিড় করে টেনে বাইরে বের করে দিলে।

গবর্ণর স্পেন্সার তখন নাজামের পাশে একখানি কুর্সিতে বসে বললেন: নাজাম! হামাদের bonus না দিলে হামি-লোগ তোমাকে তক্তে বসিতে দিবে না।

নাজামদ্দৌল্লা রেগে বললেন: কিসের বোনাস্! আব্বাজান আমাকে তক্তে বসিয়ে গেছেন! তোমাদের এক পয়সাও ঘুষ দেব না।

মিডল্‌টন্ বললেন: তোমার বাপজান ভি হামাকে দুই দুই-

বার নবাবী তক্তের জন্য bonus দিয়াছে। তোমাকে ভি দিতে হইবে।

তারপর একখানি কাগজ বার করে বললেন : এখানে সহি কর।

—মানে ?

—ইহা সন্ধিপত্র। সহি কর।

নাজামদ্দৌল্লা বললেন : মহারাজ নন্দকুমারের সঙ্গে পরামর্শ না করে আমি সই করব না।

স্পেন্সার : Shut up. যদি নবাবী তক্তে বসিতে চাও, নন্‌কুমারের নাম মুখে আনিয়ো না। সে তোমার দেওয়ান নহে। কোম্পানী মহম্মদ রেজা খান্‌কে দেওয়ান নিযুক্ত করিয়াছে।

ক্রোধে, বিস্ময়ে নাজামদ্দৌল্লার মুখে কথা সরে না। মহম্মদ রেজা খান্ নবাবের পাওনা কুড়িলক্ষ টাকা আজো ফিরিয়ে দেননি। সেই ব্যক্তিকেই কোম্পানী মুর্শিদাবাদের দেওয়ান নিযুক্ত করিতে চায়।

নাজাম : অসম্ভব! মহম্মদ রেজা খান্‌কে আমি কিছুতেই দেওয়ান নিযুক্ত করব না।

মহম্মদ রেজা খান্ দরজার বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। মিডল্‌টন্ ইসারা করতেই নবাবের সামনে এগিয়ে এলেন। নাজামদ্দৌল্লা দৃঢ়স্বরে বললেন : মহম্মদ রেজা খান্! তুমি এখানে ?

মহম্মদ রেজা খান্ঃ কারণ আমি হচ্ছি বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব-সুবা।

মিথ্যে কথা!...গর্জ্জে উঠলেন নাজামদ্দৌল্লাঃ আমি তোমাকে নিয়োগ-পত্র দিইনি।

স্পেন্সারঃ এই কাগজে মহম্মদ রেজা খানের নিয়োগের কথাও রহিয়াছে। এক্ষুণি তোমাকে সহি করিতে হইবে।

—না না। কিছুতেই আমি সই করব না।

—নাজামদ্দৌল্লা! এই মুহূর্ত্তে সই না করিলে নবাবী তক্তে তোমাকে বসিতে দেওয়া হইবে না।

মহম্মদ রেজা খান্ ফোঁড়ন দিয়ে বললেনঃ সাহেবদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটী করে নবাব সিরাজদ্দৌল্লার কি হয়েছিল জান ত'? তোমারও তাই হবে।

চুপ রহো বেইমান!...নাজামদ্দৌল্লা ধমক দিলেন। কিন্তু ভয়ে তাঁর অন্তরাত্মা কাঁপতে লাগল।

মহম্মদ রেজা খান্ঃ তোমার বাবা সাহেবদের যমের মত ভয় করতেন। তুমি কি না সেই বাপের ব্যাটা হয়ে কোম্পানীর সঙ্গে ঝগড়া করতে চাইছ! এই কাগজে সই না করলে কিছুতেই নবাবী তক্তে তোমাকে বসতে দেওয়া হবে না।

—না না, কিছুতেই আমি সই করব না। মহারাজের সঙ্গে পরামর্শ না করে আমি কিছুতেই সই করব না।

বলতে বলতে নাজামদ্দৌল্লা উঠে দাঁড়ালেন।

—নন্দকুমার! মহারাজ নন্দকুমার! নাজামদ্দৌল্লা চেঁচিয়ে

ডাকতে ডাকতে নাজাম দরজার দিকে যেতে লাগলেন। কিন্তু দরজা আগলে যে দুজন গোরা প্রহরী দাঁড়িয়েছিল, তারা নবাবের বুক লক্ষ্য করে সঙ্গীন উঁচিয়ে ধরল। রেজা খান, মিডল্‌টন, স্পেন্সার এরা সব হাসতে লাগল। নাজামদ্দৌল্লা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। মন্ত্রণা-কক্ষের যে দরজা দিয়েই তিনি পালাতে চেষ্টা করেন, সেখানেই গোরা প্রহরী তাঁর পথ আগলাচ্ছে। ভয়ে আতঙ্কে ষোল বছরের নবাবের কপাল বেয়ে ঘাম ছুটছে। তবে কি ফিরিঙ্গিরা নাজামদ্দৌল্লাকে হত্যা করতে চায়? —না…না…আমায় ছেড়ে দাও…আমায় ছেড়ে দাও …মহারাজ নন্দকুমার! এরা আমায় মেরে ফেলতে চায়… স্পেন্সার এখন সন্ধিপত্র নিয়ে এগিয়ে এলেন, বললেন: যদি প্রাণে বাঁচিতে চাও এখানে সহি কর।

প্রাণের টানে নাজামদ্দৌল্লা সন্ধিপত্রে সই করলেন। মিডল্‌টন্ বললেন: এবার হাপনি যাইতে পারে।

সেদিনই মহম্মদ রেজা খান্ নবাবের রাজকোষ থেকে প্রতিশ্রুত ঘুষের টাকা ইংরাজ প্রভুদের মিটিয়ে দিলেন।

কোম্পানীর জুলুমবাজীতে রাজপুরীতে আতঙ্কের ছায়া নামল। আমীর-ওমরাহদের ভেতর অনেকেই নন্দকুমারের অনুরাগী। তাঁরা কোম্পানীর ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হলেন। রাজধানীর ঘরে ঘরে কানাঘুষা চলতে লাগল। মহম্মদ রেজা খান্ বিব্রত বোধ করেন।

নন্দকুমার রাজধানীতে বসবাস করলে মহম্মদ রেজা খানের

পক্ষে নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করায় অসুবিধে হবে, একথা বুঝতে বাকী রইল না তাঁর।

সেরাত্রেই আবার কোম্পানীর বড় কর্ত্তাদের সঙ্গে মহম্মদ রেজা খানের বৈঠক বসল। স্থির হল, নন্দকুমারকে গ্রেপ্তার করে কলকাতায় চালান দিতে হবে।

এরকম একটা কিছু যে ঘটবে সুচতুর নন্দকুমার আগেই আঁচ করেছিলেন। তাই ভোরবেলা গোরাসিপাই যখন বাড়ী ঘেরাও করলে নন্দকুমার একটুও বিস্মিত হননি। হাসিমুখে মহারাজ মিডল্‌টন্‌কে অভ্যর্থনা করলেনঃ হঠাৎ সদলবলে আমার বাড়ীতে? কি খবর মিডল্‌টন্?

মিডল্‌টন্ বললেনঃ মহারাজ নন্‌কুমার! কোম্পানীর বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিবার অভিযোগে হামি হাপনাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে।

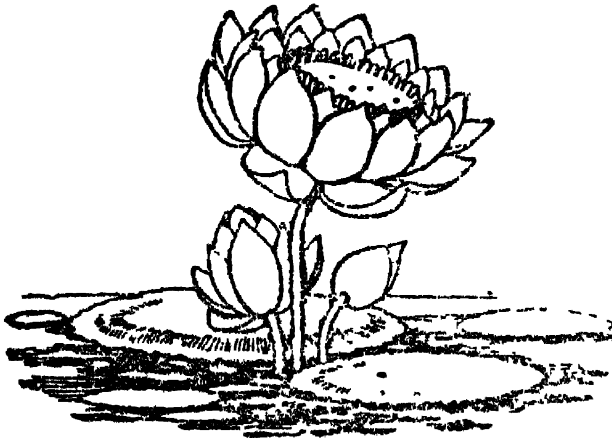
—প্রমাণ?

মিডল্‌টন্ বললেনঃ Certainly we have got all the documents. প্রমাণ আছে। হাপনি ইংরাজকে ধ্বংস করিবার জন্য দিল্লীশ্বরের উজির সুজাদ্দৌল্লাকে উত্তেজিত করিয়াছিল। হাপনি leading zemindars ও সেনাপতিদের কোম্পানীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে সংগঠিত করিয়াছিল। আপনি নবাব মীর মহম্মদ কাশেম আলিকে ইংরাজের গতিবিধির গোপন খবর বলিয়া দিতেন।

নন্দকুমার ঃ সে ত' পুরাণো কথা সাহেব। তার বিচারও শেষ হয়েছে বহুকাল। আবার এসব কথা কেন ?

মিডল্‌টন্‌ ঃ Yes, we know. লেকিন হামিলোগ আবার আপনার বিচার করিবে। You are under arrest. হামাদের সঙ্গে এক্ষুণি কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হন।

নন্দকুমার ঃ আবার বিচার করবে ? বেশ তাই হোক। আমি প্রস্তুত মিডল্‌টন্‌!



বিচারের প্রহসন

অপরিণতবয়স্ক ক্ষমতাহীন নবাব নাজামদ্দৌল্লা কোম্পানীর সভ্যদের এই জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে বোর্ড-অব-ডিরেক্টরদের নিকট করুণ আবেদন জানালেন। তা ছাড়া তিনি কি-ই-বা করতে পারেন? যে-টুকু বা স্বাতন্ত্র্য, যে-টুকু ক্ষমতা অবশিষ্ট ছিল, মহম্মদ রেজা খান্‌কে দেওয়ানী গদীতে বসিয়ে ইংরাজ তাও কেড়ে নিয়েছে!

নবাব নাজামদ্দৌল্লার করুণ আবেদন-পত্র ক্লাইবের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। নন্দকুমার সম্পর্কে ক্লাইব সব খবরই রাখতেন।

কর্ম্মদক্ষ নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণ নন্দকুমারের প্রতি ক্লাইবের কি জানি কেন একটা দুর্ব্বলতা ছিল।

নন্দকুমারের সৌভাগ্যক্রমে এই সময় ক্লাইব কার্য্যোপলক্ষে কলকাতা আসেন। সুতরাং বিচার-সভায় ক্লাইবকেই সভাপতি মনোনীত করা হল। এদিকে তখন ভ্যান্সিটার্ট, বারওয়েল প্রভৃতি কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা মহা তোড়জোড় করে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে সাক্ষী-সাবুদ যোগাড় করছেন।

এই যে বিচার-প্রহসন, ক্লাইব এর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে-ছিলেন। আসলে এ দলাদলিরই ব্যাপার। নন্দকুমার কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন এ-কথা সত্যি। কোম্পানী তার বিচারও করেছেন।

দীর্ঘকাল বাদে আজ সেই সব পুরাণো অভিযোগ উথাপন করে নন্দকুমারকে শাস্তি দিতে আর কারো বিবেকে না বাধুক, ক্লাইবের বিবেকে বাধল।

তা ছাড়া, কোম্পানীর এমন কি সর্ব্বনাশ আজ নন্দকুমার করতে পারেন, যার ভয়ে আজ এই বিচার-প্রহসনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে? দেওয়ানী গদী থেকে সরিয়ে দিয়ে যথেষ্ট শাস্তি দেওয়া হয়েছে নন্দকুমারকে। আর কেন?

নবাবের প্রতি অন্যায় অভদ্রোচিত ব্যবহারের জন্য ক্লাইব সহকর্ম্মীদের তিরস্কার করে মহারাজ নন্দকুমারকে বেকসুর খালাস দিলেন।



ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

মহম্মদ রেজা খান্ সরকারী কাগজপত্রে নবাবের শীল-মোহরের পরিবর্ত্তে নিজের শীলমোহর ব্যবহার করতে সুরু করলেন। দৈনন্দিন রাজকার্য্য-সম্পাদনে তিনি নবাবের সঙ্গে পরামর্শ করা দূরের কথা, নবাবকে সযত্নে পরিহার করে চলতে লাগলেন। এমন কি, নবাব নিজে দেখা করতে এলেও রেজা খান্ প্রায়ই তাঁকে দপ্তরের বাইরে থেকে ফিরিয়ে দিতে লাগলেন।

নবাব নাজামদ্দৌল্লার বুঝতে বাকী রইল না, মহম্মদ রেজা খান্ তাঁকে গ্রাস করতে চান।

নিজের পকেট ভর্ত্তি করতে ব্যস্ত মহম্মদ রেজা খানের দেশের লোকের দিকে ফিরে তাকাবার সময় কোথায়! এ-হেন রেজা খানের রাজত্বে কোম্পানীর কর্ম্মচারী ও গোমস্তার অত্যাচার চরমে উঠবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি!

হাটে-বাজারে, সহরে-মোকামে ইংরাজ গোমস্তার জোর-জুলুম ও অত্যাচার জনসাধারণের ভেতর বিভীষিকা সৃষ্টি করতে লাগল আবার।

তারা অভাবনীয় চড়াদামে তামাক, সুপারী ও লবঙ্গ বেচতে লাগল। এককালে বাংলাদেশ লবণ ব্যবসায়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেছিল। কাশ্মীরি, মুলতানি, শিখ ও ভাটিয়া

ব্যবসায়ীরা এ-দেশ থেকে লবণ আমদানি করতেন। বাংলার হাজার হাজার লোক এ-ব্যবসায় থেকে জীবিকা নির্ব্বাহ করত। কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের জোর-জুলুম ও অত্যাচারে লবণ ব্যবসা নষ্ট হল।

নুনের চেয়েও বাংলার তাঁতজাত বস্ত্রশিল্পের ব্যবসা ছিল আরো ব্যাপক। বাংলার তাঁতিদের তৈরী বস্ত্র পৃথিবীর বহুদেশে রপ্তানি করা হত। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা তাঁতিদের দাদন খাইয়ে নাম মাত্র মূল্যে তাঁতজাত বস্ত্র কিনে নিয়ে সেগুলো বিদেশে চালান দিয়ে প্রচুর মুনাফা করতে লাগল।

দেখতে দেখতে বাংলার তাঁতিরা কোম্পানীর ক্রীতদাসে পরিণত হল। কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের মুনাফার জন্য তারা দিনরাত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটে, অথচ নিজেরা দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না। যারা অতিরিক্ত খাটতে অস্বীকার করল, তাদের উপর চলল নির্ম্মম অত্যাচার। কোম্পানীর অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাবার আশায় শেষ পর্য্যন্ত বহু তাঁতি নিজেদের বুড়ো আঙ্গুল নিজেরাই কেটে ফেলল। লবণ-শিল্পের মত, এ-ভাবে বাংলায় বস্ত্র-শিল্পও নষ্ট হল।

তামাক, পান, সুপারী, লবঙ্গ—এমন কি শেষ পর্য্যন্ত কোম্পানীর গোমস্তারা বিবাহ-ব্যাপারে বর ও কন্যা উভয় পক্ষ থেকে তিনটাকা করে বিয়ের ট্যাক্স আদায় করতে লাগল।

কোম্পানীর এমনিধারা অত্যাচারে অসংখ্য লোক জীবিকা-চ্যুত হওয়ায় আকাশে বাতাসে মন্বন্তরের পূর্ব্বাভাস সূচিত

হল। মহম্মদ রেজা খান্ বড়লোক হওয়ার এ সুযোগ কি হারাতে পারেন? তাঁর স্বার্থপর কর্ম্মচারীরা ব্যাপারী-দের চালের নৌকো আটকে নাম-মাত্র মূল্যে লক্ষ লক্ষ মণ চাল কিনে গুদামজাত করতে লাগল! যারা কম দামে চাল বেচতে আপত্তি করলে, তাদের উপর জোর-জুলুম করা হল। যেখানে যা চাল পাওয়া গেল, কর্ম্মচারীরা সব কিনে আনল। গুদামের পর গুদাম সেই সব চালে ভর্ত্তি হয়ে উঠল। এদিকে একমুঠো চালের জন্য রাজধানীর পথে বুক-ফাটা ক্রন্দন উঠেছে। মহম্মদ রেজা খানের দু'একজন প্রবীণ ধর্ম্মনিষ্ঠ কর্ম্মচারী এতে বিচলিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু রেজা খানের হৃদয় এত সহজে টলে না।

—দয়া—মায়া—মমতা, মহম্মদ রেজা খানের নেই। টাকা চাই, টাকা! টাকা দিয়ে মুর্শিদাবাদের নবাব—সুবার তক্ত কিনেছি।···প্রয়োজন হলে টাকা দিয়ে স্বর্গের সিঁড়ি কিনব!···

সেই চাল বিক্রী করে মহম্মদ রেজা খান্ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হলেন।

কার্টিহার সাহেব তখন কোম্পানীর গবর্ণর। মহম্মদ রেজা খানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলল কার্টিহারের শোষণ। ব্যাপকভাবে চালের আড়তদারী না করলেও কোম্পানীর গোমস্তা ও কর্ম্মচারীরা ধান-চালের ব্যবসা করে মোটা টাকা মুনাফা করলে।

গভর্ণর কার্টিহারের হুকুমে কোম্পানী, নিজেদের সৈন্য-সামন্ত ও কর্ম্মচারীদের নিরাপত্তার জন্য, চাষী ও ব্যাপারী-দের ধান-চাল কেড়ে নিয়ে নিজেদের গুদামে জমিয়ে রাখল। কার্টিহার আদেশ দিলেনঃ কোম্পানীর রাজস্ব যেন কিছুতেই বাকী না পড়ে। দুর্ভিক্ষের দোহাই পেড়ে যারা রাজস্ব ফাঁকি দেবে, তাদের উপর নির্ম্মম অত্যাচার করতে দ্বিধা করবে না।

এরপর দুর্ভিক্ষপীড়িত চাষী, তাঁতি ও সাধারণ প্রজার উপর চলল কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের অমানুষিক অত্যাচার। চাষীদের ঘরে দুর্দ্দিনের সঞ্চয় ধান-চাল যা তারা পেলে সবই নিলে কেড়ে। এমন কি, বীজ-ধান্যও বাদ পড়ল না। জমি-জমা, ঘর-বাড়ী মায় ঘটী-বাটি নিলামে চড়ালে তারা। তাঁতিদের চরকা ও তাঁত নীলামে উঠল। শুধু তাই নয়, ধনরত্ন লুকিয়ে রেখেছে—এই সন্দেহে তারা কত লোককে যে হত্যা করলে তার ইয়ত্তা নেই।

কোম্পানীর অত্যাচারের তুলনায় মহম্মদ রেজা খানের অত্যাচার কিছুই নয়। গবর্ণর কার্টিহারের আনন্দ আর ধরে না। এই দুর্ভিক্ষের বৎসরে কোম্পানী অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশী রাজস্ব আদায় করেছে। ছিয়াত্তরের মনন্তরের বছরেও কোম্পানী অংশীদারদের মোটা লভ্যাংশ দিয়েছিল, কিন্তু এর জন্য বাংলার জনসাধারণের এক-চতুর্থাংশকে জীবন দিতে হইয়াছিল।

মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি—



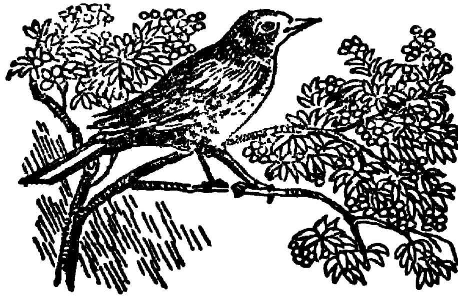
আপনাদেব ছেড়ে যেতে বড় কষ্ট হচ্ছে···বড় কষ্ট··

পৃষ্ঠা—১৩১

দেশের উপর যখন প্রকৃতি ও পিশাচদের এমনি তাণ্ডব লীলা চলছিল, নন্দকুমার নিরপেক্ষ দর্শক সেজে চুপ করে বসে না থেকে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের মধ্যে চাল ইত্যাদি সাধ্যমত বিতরণ করে সাহায্য করেছিলেন।

প্রধানত মহারাজ নন্দকুমারের চেষ্টায় গভর্ণর কার্টিহার ও মহম্মদ রেজা খানের চালের ব্যবসার কথা বিলাতে কোম্পানীর বোর্ড-অব-ডিরেক্টার জানতে পারেন। বিপদের সঙ্কেত-সূচক ইঙ্গিত পেয়ে কার্টিহার পদত্যাগ করে আত্মরক্ষা করলেন। কার্টিহারের পদত্যাগে কোম্পানীর বোর্ড-অব-ডিরেক্টার হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

ওয়ারেন হেষ্টিংস বড়লাট নিযুক্ত হয়ে কলকাতায় এলেন, কার্টিহারের স্থান পূর্ণ করতে। মহম্মদ রেজা খান্‌কে বিচার-সাপেক্ষে বন্দী করে কলকাতায় নিয়ে আসার জন্য হেষ্টিংসের উপর হুকুম এল।



আবার ওয়ারেন হেষ্টিংস

মহারাজ নন্দকুমারের পুরানো শত্রু হেষ্টিংস। কেরাণী, গুপ্তচর, অবৈতনিক সিপাই, মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট, এরপর কলিকাতার কাউন্সিলের সভ্যপদে কিছুকাল কাজ করে হেষ্টিংস সঞ্চিত টাকাপয়সা নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

দীর্ঘকাল পরে আবার তিনি বাংলা রঙ্গমঞ্চে ধূমকেতুর মত উদিত হলেন। এবার আর রামা শ্যামা রূপে নয়! কোম্পানীর বড়লাট বাহাদুরের পদবী নিয়ে! হেষ্টিংসের প্রত্যাবর্ত্তনে কান্তমুদী, রাজা নবকৃষ্ণ, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রভৃতি তাঁর পুরানো ভক্তরা উল্লসিত হয়ে উঠলেন।

মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে দুর্নীতিপরায়ণ কর্ম্মচারী বলে হেষ্টিংস কুখ্যাতি অর্জ্জন করে-ছিলেন। সেদিন তাঁকে উপরওয়ালাকে ভয় করে চলতে হত। কিন্তু আজ তিনি সর্ব্বশক্তিমান।

হেষ্টিংস নন্দকুমারকে লাটভবনে ডেকে পাঠালেন। সৌজন্য ও বিনয় সহকারে তাঁকে অভ্যর্থনা করে বললেন: মহারাজ নন্‌কুমার! ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা শুনিয়া কোম্পানীর বোর্ড-অব-ডিরেক্টার আন্তরিক দুঃখিত। তাঁহারা চান, কোম্পানীর সুশাসনে দেশীয় লোকেরা সুবিচার পাইবে। নবাব-সুবা মহম্মদ রেজা খান্ দেশের সমস্ত চাল আটকাইয়া

লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটাইয়াছে। তাই বোর্ড হামাকে হুকুম দিল, মহম্মদ রেজা খান্‌কে বন্দী কর। তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষী প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আদালতে তাহাকে অভিযুক্ত কর। হাপনাকে মহম্মদ রেজা খানের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে হইবে।

মহারাজ বললেন: শুধু মহম্মদ রেজা খানের ঘাড়ে দোষ চাপালে চলবে কেন লাট বাহাদুর! মন্বন্তরে এই যে তিরিশ লক্ষ লোক না খেয়ে মরল, তার জন্য গবর্ণর কার্টিহার ও কোম্পানীর কর্ম্মচারীরাই কি কিছু কম দায়ী?

কার্টিহার পদত্যাগ করিয়াছেন।...হেষ্টিংস গম্ভীর স্বরে বললেন: কোম্পানি মহম্মদ রেজা খানের বিচার করিবে। হাপনি আমাকে সাহায্য করিবেন।

নন্দকুমার: বেশ, মহম্মদ রেজা খানের বিরুদ্ধে আমি যা জানি, সবই বলব।

মহম্মদ রেজা খান কিন্তু সব খবরই রাখেন। এ কথাও তিনি জানতেন, মহারাজ নন্দকুমার আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে মুক্তি পাবার কোন আশা নেই তাঁর। তাই তিনি গোপনে নন্দকুমারের বাড়ীতে এসে হাজির হলেন।

—মহারাজ নন্দকুমার! মহম্মদ রেজা খান কাকুতি মিনতি করতে লাগলেন: আপনি মহাপ্রাণ ব্যক্তি। পূর্ব্ব শত্রুতা ভুলে গিয়ে আমায় বাঁচান। আমি আপনাকে দু'লক্ষ টাকা ঘুষ দেব!

দু'লক্ষ টাকা?...নন্দকুমার বিস্মিত স্বরে বললেন: কিন্তু

লাট বাহাদুর! আমি সাক্ষী দিই আর না দি' লাটবাহাদুর ত' আপনাকে ছেড়ে কথা কইবেন না!

মহম্মদ রেজা খান্ তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন: লাটবাহাদুর ওয়ারেন হেষ্টিংসের জন্য আমার ভাবনা নেই। ওকে কিনে নেবার জন্য দশলক্ষ টাকা রেখে দিয়েছি আলাদা করে। এখন আপনি যদি রাজী হন তবেই হয়!

নন্দকুমার বিদ্রূপ করে বললেন: চালের কারবার করে বিলক্ষণ দুপয়সা রোজগার করেছেন দেখছি!

—তা করেছি।

নন্দকুমার বললেন: আমাকে ক্ষমা করবেন। মিথ্যে সাক্ষ্য আমি দিতে অক্ষম। আপনি বরং লাটবাহাদুরের কাছেই যান। লাটবাহাদুর দশলক্ষ টাকা নিয়ে যদি মোকদ্দমা প্রত্যাহার করেন, আমার সাক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন হবে না তখন। কেন মিছিমিছি আমাকে দু'লক্ষ টাকা দেবেন!

দশলক্ষ অনেক টাকা। হেষ্টিংস রেজা খানের বিরুদ্ধে আদালতে বিচার তুললেন না। কিছুদিন হাজতবাসের পর মহম্মদ রেজা খান্ বেকসুর মুক্তিলাভ করলেন। মহম্মদ রেজা খানের বিচার-প্রহসনের যে এ ভাবেই যবনিকা পড়বে, নন্দ-কুমার তা আগেই অনুমান করেছিলেন।

এ সময় কলকাতায় কোম্পানীর সুপ্রীম কাউন্সিল স্থাপিত হয়। গবর্ণর জেনেরেল হেষ্টিংস সুপ্রীম কাউন্সিলের সভাপতি

ও জেনেরেল ক্লেবারিং, কর্ণেল মনসন্, স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস্ ও বারওয়েল সদস্য নিযুক্ত হন। ক্লেবারিং, মনসন্ ও ফ্রান্সিস্ বিলাত থেকে কলকাতায় আসেন। একই জাহাজে সুপ্রীম কোর্টের জজ হাইড্, চেম্বার্স, লেসিষ্টার ও প্রধান বিচারপতি স্যার এলাইজ্যা ইম্পে কলকাতা আসেন।

বড়লাটভবনে তাঁদের অভ্যর্থনা করে যে অনুষ্ঠান হয়, তাতে মহারাজ নন্দকুমার ছাড়া প্রায় সবাইকেই নেমন্তন্ন করা হল। হেষ্টিংস নবাগত জজ ও কাউন্সিল সদস্যদের সঙ্গে সবার আলাপ করিয়ে দিলেন।

কিন্তু নন্দকুমারও চুপ করে বসে থাকবার পাত্র নন। তিনি হেষ্টিংসের বিরুদ্ধবাদী কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের সাহায্যে সদস্যদের সঙ্গে পরিচিত হলেন।

সেদিন নন্দকুমার ঠাকুরদালানে বসে লিখছিলেন। পাশে বসে ক্ষেমঙ্করী। ভৃত্য এসে বললেঃ কমলউদ্দীন হুজুরের সঙ্গে দেখা করতে চায়। নন্দকুমার বললেনঃ পাঠিয়ে দাও এখানে। ক্ষেমঙ্করী উঠছিলেন, নন্দকুমার বললেনঃ চিনতে পাচ্ছ না? আমাদের কমল গো! বহরমপুরের বাড়ীতে অনেকদিন ছিল।

ক্ষেমঙ্করী বললেনঃ তাই বল।

কমলউদ্দীন লম্বা সেলাম ঠুকে সামনে এসে দাঁড়াল। বললেঃ আদাব আরজ মহারাজ! আদাব আরজ রাণী সাহেবা!

বস কমল। নন্দকুমার বললেনঃ তারপর কি খবর বল। তোমার নূনের কারবার কেমন চলছে আজকাল ?

লবণের ব্যবসা কোম্পানীর গ্রাস করার কথা অন্যত্র বলেছি। লবণপ্রস্তুতকারী মলঙ্গীদের উপর কোম্পানীর কর্ম্মচারী ও গোমস্তারা অকথ্য অত্যাচার করত। ইজারাদারেরা কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের মোটা টাকা ঘুষ দিতে বাধ্য হত। পক্ষান্তরে তারা মলঙ্গীদের উপর জুলুম করে সে ক্ষতি পুষিয়ে নিত। কমলউদ্দীন একজন ইজারাদার ছিল। সে বললেঃ আজ্ঞে মহারাজ, বিবেচনা করুন, ব্যাটা ঘুষখোরদের জ্বালায় মুনাফা করবার কি আর জো আছে !

নন্দকুমারঃ ভবিষ্যতে যাতে ঘুষ দিতে না হয়, সে ব্যবস্থা আমি করছি। হ্যাঁ, আর্চিডেকিন ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নামে নালিশ জানিয়ে তুমি যে আর্জ্জি দিয়েছিলে, ফাউক সাহেবের হাত দিয়ে আমি তা যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছি।

বলেন কি মহারাজ ! কমলউদ্দীন লাফিয়ে উঠল। ভীত-স্বরে বললেঃ আমি যে সেই আর্জ্জিখানা, বিবেচনা করুন, ফেরত চাইতে এসেছি।

নন্দকুমারঃ কেন কমল? গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তোমার কাছ থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা ঘুষ নিয়েছেন, লাটসাহেব নিয়েছেন পনেরো হাজার টাকা। আর্জ্জি ফেরত নিলে এ জুলুমের বিচার কি করে হবে কমল ?

কমলঃ কিন্তু মহারাজ, বিবেচনা করুন, এ আর্জ্জির কথা

শুনে লাটবাহাদুর যদি আমার উপর ভীষণ রেগে যান! বিবেচনা করুন, তাহলে যে একেবারে ধনে-প্রাণে মারা পড়ব। বাপ্‌রে বাপ! লাটবাহাদুর রাগলে কি আর রক্ষা আছে!

নন্দকুমার: তোমার কোন ভয় নেই কমল! লাটবাহাদুরের কাছে কৈফিয়ত তলব করবার লোকও রয়েছেন।

কমল: তা আর জানিনে মহারাজ! তবে কিনা, তিনি হচ্ছেন লাটবাহাদুর। সর্ব্বশক্তিমান। আচ্ছা, আজ তাহলে আসি মহারাজ! সালাম!

বাইরে রাস্তায় পাল্কীর ভেতর গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। কমলউদ্দীন কাছে এসে দাঁড়াতেই বললেন: আর্জ্জি ফেরত এনেছ?

কমলউদ্দীন হতাশ স্বরে বললে: না সিঙ্গিমশাই! মহারাজ আর্জ্জি ফেরত দিলে না।

গঙ্গাগোবিন্দ: দিলে না?

না সিঙ্গিমশাই! বললে, বিবেচনা করুন, কাউন্সিলে নালিশ হয়ে গেছে।

গঙ্গাগোবিন্দ রেগে বললেন: বটে? লাটসাহেবের বিরুদ্ধে, কোম্পানীর বিরুদ্ধে নালিশ করার মানেটা কি একবার বুঝতে পেরেছ?

কমল বোকার মত বললে: না সিঙ্গিমশাই! মানেটা, বিবেচনা করুন, বুঝতে পারিনি।

গঙ্গাগোবিন্দ ঃ লাটবাহাদুর তোমাকে ফাঁসিগাছে চড়াবেন বেকুব কোথাকার। এই চল্!

পরক্ষণেই বিমূঢ় কমলকে পেছনে ফেলে পাল্কীর বাহকেরা গঙ্গাগোবিন্দকে নিয়ে পথের বাঁকে অদৃশ্য হল। ফাঁসি! কথাটা হৃদয়ঙ্গম করতে এক মুহূর্ত্ত সময় লাগে কমলের। তবে কি শেষ পর্য্যন্ত তার ফাঁসি হবে? ইয়া আল্লা! ভয়ে ভাবনায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। কমলউদ্দীন চেঁচাতে লাগল ঃ সিঙ্গিমশাই! ও সিঙ্গিমশাই!···বিবেচনা করুন, আমার কি তাহলে ফাঁসি হবে?···ও সিঙ্গিমশাই···

কমলউদ্দীন ঊর্দ্ধবাহু হয়ে পাল্কীর পিছু পিছু ছুটতে লাগল। সিঙ্গিমশাই, ও সিঙ্গিমশাই···

ভয়ে ভাবনায় কমলের প্রাণপাখী খাঁচা ছাড়া হবার যোগাড় আর কি। লাটবাহাদুরের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করা ছাড়া কমলউদ্দীন আর কোন পথ দেখতে পায় না। ছুটতে ছুটতে সে লাটভবনে এসে হাজির হয়। বেয়ারা, বাবুর্চ্চি, চৌকিদার, খানসামা, বেনিয়ান—সবাইকে প্রায় ঠেলে কমলউদ্দীন লাটবাহাদুরের বৈঠকখানায় ঢুকল।

—দোহাই কোম্পানী! দোহাই লাটবাহাদুর! আমি কিছু জানি না। আমি নির্দ্দোষ। দোহাই বাবা কোম্পানী, আমায় ফাঁসি-গাছে চড়াবেন না!

কমলউদ্দীন পাগলের মত একমনে বকেই যেতে লাগল লাটবাহাদুর যে ঘরে নাই এক মুহূর্ত্ত তার খেয়ালই হয় না।

হেষ্টিংসের ভাবী পত্নী মেরী একখানি কাউচে বসে আরাম করছিলেন, কমলউদ্দীন দিগ্বিদিক-জ্ঞান হারিয়ে তাঁর পা দুখানি জড়িয়ে ধরল।

—দোহাই বাবা মেরিয়ান আলিপুরী! তুমি আমার ধর্ম্মবাপ। তোমার পায়ে পড়ি বিবিসাব! আমায় বাঁচাও! আমি নালিশ করিনি, আমি নালিশ করিনি!

—You rat! বিরক্ত হয়ে মেরি উঠে দাঁড়ালেন। গোলমাল শুনে হেষ্টিংস ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন: কি হইয়াছে কমল?

কমল তখন হাউ-মাউ করে কাঁদতে সুরু করেছে। বললে: আমি নালিশ করিনি লাটবাহাদুর! আমি নির্দ্দোষ। বিবেচনা করুন, ঐ মহারাজ নন্দকুমারই যত নষ্টের গোড়া। জবরদস্তি করে আমাকে দিয়ে আর্জ্জিতে সই করিয়ে নিলে; বিবেচনা করুন, দোহাই আপনার! আমায় ফাঁসিগাছে চড়াবেন না।

হেষ্টিংস এক মুহূর্ত্ত কি ভেবে বললেন: তোমার কোন ভয় নাই কমল। যতদিন তুমি আমার আদেশ পালন করিবে, কেউ তোমায় ফাঁসিগাছে চড়াইবে না।

—হুজুর মা-বাপ!

—তুমি কাল একবার আসিবে। কথা আছে।

সেইদিনই লাটবাহাদুর মহারাজ নন্দকুমারকে ডেকে পাঠালেন।

—মহারাজ নন্‌কুমার! হামি আর একবার আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই, আমার শত্রুদলে যোগ দিয়া হাপনি নিজের ক্ষতিসাধন করিবেন। হামার নিজের সুবিধার জন্য যাহা ভাল হইবে, হামি তাহাই করিবে। হাপনি আমাকে বাধা দিতে পারিবে না। ভুলিয়া যাইবেন না, হামি কোম্পানীর বড়লাটবাহাদুর—সর্ব্বশক্তিমান।

নন্দকুমার দৃঢ়স্বরে বললেন: শত্রুতা আমি কারো সঙ্গে করতে চাইনে লাটবাহাদুর! কিন্তু আপনার স্বৈরাচার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আপনি কি কোনদিন নিজের কার্য্যাবলীর কথা ভেবে দেখেছেন? রাণী ভবানীর বাহারবন্দ পরগণা কেড়ে নিয়ে কান্তমুদীকে দান করলেন। দশ লাখ টাকা ঘুষ খেয়ে মহম্মদ রেজা খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নিলেন।

You shut up! চেঁচিয়ে উঠলেন হেষ্টিংস; shut up I say!

নন্দকুমার: ভয় দেখিয়ে আপনি আমার মুখ বন্ধ করতে পারবেন না।

Dare you challenge me, sir?

নন্দকুমার: লাটবাহাদুর! এ-কথা আমি আপনাকে স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, প্রয়োজন হলে নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও নন্দ-কুমার অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।

I see! ফেটে পড়লেন হেষ্টিংস: হামি আপনাকে challenge করিতেছি। হাপনার যতদূর সাধ্য আমার

অনিষ্ট সাধন করিবেন। **Now get out, get out of my house.**

নন্দকুমার ঃ বাড়ী ডেকে এনে খুব ভদ্রতা দেখালে সাহেব!

নন্দকুমার আর দাঁড়ালেন না, দ্রুত বেরিয়ে এলেন পথে। ক্রোধে আক্রোশে হেষ্টিংস ঘরময় পায়চারি করে বেড়াতে লাগলেন।

লাটবাহাদুর হেষ্টিংসের রক্তচক্ষুর ভয়ে হয়ত অনেকেই কর্ত্তব্যপথ থেকে বিচলিত হতেন, কিন্তু নন্দকুমারের জেদ চেপে গেল। হেষ্টিংসের অপকীর্ত্তির যে ফিরিস্তি তিনি উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ সহ সংগ্রহ করেছিলেন, এবার নন্দকুমার তা সুপ্রীম কাউন্সিলের সভ্যদের নিকট প্রেরণ করলেন।

জেনারেল ক্লেবারিং, কর্ণেল মন্‌সন, স্যার ফ্রান্সিস্ কাউন্সিলের অধিবেশনে নন্দকুমারের চিঠি প্রেসিডেণ্ট হেষ্টিংসের নিকট দিলেন। চিঠি পড়ে হেষ্টিংসের ক্রোধের সীমা রইল না। নন্দকুমারের এত স্পর্দ্ধা যে তাঁর বিরুদ্ধে কাউন্সিলে অভিযোগ করেন! অনেক কথা কাটাকাটির পর স্থির হল, নন্দকুমারকে তাঁর অভিযোগপত্র প্রত্যাহার করবার সুযোগ দেওয়া হবে; অন্যথায় উপযুক্ত সাক্ষীসাবুদ সহ কাউন্সিলে উপস্থিত হতে হবে তাঁকে। হেষ্টিংসের মনে ক্ষীণ আশা ছিল, শেষ পর্য্যন্ত হয়ত নন্দকুমার অভিযোগ প্রত্যাহার করবেন। কিন্তু নন্দকুমার অভিযোগ প্রত্যাহার করতে রাজী হলেন না। আত্মীয়, বন্ধু, হিতৈষীরা তাঁকে বুঝাতে লাগলেন, প্রতিহিংসাপরায়ণ লাট

হেষ্টিংস নন্দকুমারের চরম ক্ষতি করতেও দ্বিধা করবেন না। কিন্তু নন্দকুমার অটল। সেদিনই তিনি কাউন্সিলে চিঠি লিখলেন : "উক্ত অভিযোগের কোন অংশই আমি পরিবর্ত্তন করিতে চাহি না। আমার অভিযোগের সত্যাসত্য প্রমাণ করিবার জন্য, আমি আপনাদের সম্মুখে সাক্ষীসাবুদ সহ উপস্থিত হইতে প্রস্তুত।"

নন্দকুমারের চিঠি পড়ে দুর্ভাবনায় হেষ্টিংসের অন্তর ভারী হয়ে উঠল। নন্দকুমার কি চান? কাউন্সিলের সভ্যদের কাছে কি শেষকালে অপদস্থ হতে হবে! কে জানে, এ ব্যাপার বেশীদূর গড়ালে শেষ পর্য্যন্ত হয়ত বাধ্য হয়েই হেষ্টিংসকে পদত্যাগ করতে হবে।

সেদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে হেষ্টিংস স্বপ্ন দেখেন, সেই পুরানো দিনের দুঃখ, দারিদ্র্যময় অখ্যাত নগণ্য জীবনে তিনি আবার ফিরে গেছেন।...কোম্পানীর গুপ্তচর হেষ্টিংস। নবাব দরবারের গোপন খবর কোম্পানীকে জানিয়ে দেবার অপরাধে, নবাব সিরাজদৌল্লা হেষ্টিংসকে গ্রেপ্তার করবার আদেশ দিয়েছেন। নবাবের অশ্বারোহী সিপাই তাঁর খোঁজে বেড়াচ্ছে। ধরা পড়লে মৃত্যু অবধারিত।...প্রাণভয়ে ভীত হেষ্টিংস তিনদিন ধরে গভীর অরণ্যে আত্মগোপন করে আছেন। কাঁটা ঝোপে শরীর ক্ষত-বিক্ষত। কিন্তু ক্রমেই তিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়লেন। ক্ষিধের জ্বালা সইতে না পেরে সেদিন মাঝরাতে তিনি লোকালয়ে বেরিয়ে এলেন।

রাস্তাঘাট নিঝ্‌ঝুম। দোকান-পাট, হাট-বাজার সব বন্ধ। কান্তমুদীর দোকানের বন্ধ দরজার ভেতর তখনো টিমটিম করে মাটীর প্রদীপ জ্বলছিল। হেষ্টিংস দরজায় টোকা দিলেন।

—কে? ভেতর থেকে কান্তমুদীর স্বর ভেসে এল: এত রাতে কে এল?

—কাণ্ট্‌! আমি হেষ্টিংস। দরজা খোল। শীগ্‌গির! কান্তমুদী দরজা খুলতেই হেষ্টিংস ভেতরে ঢুকে দরজায় খিল এঁটে দিলেন।

—নবাবের সিপাই হামাকে খুঁজিতেছে কাণ্ট্‌। ধরা পড়িলে মৃত্যু নিশ্চিত।

কান্তমুদী বিরক্ত স্বরে বললে: তা তুমি মরবে মরো। সঙ্গে সঙ্গে কি আমাকেও প্রাণে মারতে চাও? তোমাকে আশ্রয় দিয়েছি, নবাব যদি ঘুণাক্ষরেও একথা জানতে পারেন···

—নবাব জানিতে পারিবে না কাণ্ট্‌। আমি বেশীক্ষণ থাকিব না। চলিয়া যাইব।

—তবে কি আমাকে মুখ দেখাতে এসেছ সাহেব? কি দরকার ছিল এখানে আসার?

সহসা হেষ্টিংস কান্তমুদীর দু'হাত জড়িয়ে ধরলেন: হামার প্রাণ বাঁচাও কাণ্ট্‌। তিনদিন পেটে কিছু পড়ে নাই। ক্ষুধার জ্বালায় হামি মরিয়া যাইবে। হামাকে কিছু খাইতে দাও কাণ্ট্‌।

কান্তমুদী বললে: এই মাঝরাতে তোমাকে কি খেতে দেব বলত!

—যাহা আছে তাহাই দাও।

—চাড্ডি পান্তা আছে। খাবে ?

—পান্টা। Oh how sweet the name! তাই দাও কান্ট্। হামার প্রাণ বাঁচাও!

হেষ্টিংসের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ধড়মড় করে তিনি বিছানায় উঠে বসেন। এত স্বপ্ন নয়! এ যে তার অতীত জীবনের এক অধ্যায়!

*

পরদিন সুপ্রীম কাউন্সিলের অধিবেশনে হেষ্টিংস নন্দকুমারের অভিযোগপত্র কাউন্সিলে বিবেচনা করতে অস্বীকার করেন।

—আমি জানি আমাকে অপদস্থ করবার জন্য যে ষড়্‌যন্ত্র চলছে নন্দকুমার তার নায়ক। আর, এই সভার কেউ কেউ তাতে লিপ্ত আছেন। তা না হলে, আমার বিরুদ্ধে কোথাকার কে এক নীচমনা ব্রাহ্মণ নন্দকুমারের ঈর্ষ্যাপ্রযুক্ত মিথ্যা অভিযোগপত্র গ্রহণ করে, আপনারা আপনাদের সভাপতির অবমাননা করতে চাইতেন ?

সভ্যেরা বললেন ঃ ষড়্‌যন্ত্রের কথা সত্য নহে। নন্দকুমার বাইরে অপেক্ষা করছেন। তাঁকে ডেকে এনে সামনাসামনি কথাবার্ত্তা হোক। Bring Noncoomer here.

Wait a minute. হেষ্টিংস সশব্দে টেবিল চাপড়ে বললেন ঃ আমি আজকের মত সভা ভঙ্গ করছি।

হেষ্টিংসের বন্ধু কাউন্সিলের অন্যতম সভ্য বারওয়েলও

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেনঃ Gentlemen! প্রেসিডেন্ট আজকের মত সভা ভঙ্গ করেছেন। প্রেসিডেন্টের অনুপস্থিতিতে সভার কাজ চলতে পারে না। Good night.

বারওয়েলও বেরিয়ে গেলেন।

ক্লেবারিং, মন্‌সন্‌ ও ফ্রান্সিস্‌ পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন।

নন্দকুমার বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছিলেন।

সভ্যেরা তাঁকে ডেকে পাঠালেন। নন্দকুমার প্রবেশ করতেই সবাই স-সম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন।

—মহারাজ নন্দকুমার! প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা করিতে হামিলোগ অক্ষম। সম্ভবত হাপনি সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করিতে পারিবেন। কিন্তু তার আগে, কোম্পানীর এটর্ণির সঙ্গে সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন। তাহার পরামর্শ অনুসারে হাপনি কাজ করিবেন।

নন্দকুমার বললেনঃ তাই ভাল। আমি কোম্পানীর উকিলের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ নিয়ে সুপ্রীম কোর্টে লাট-বাহাদুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করব।

সুপ্রীম কাউন্সিলের সভা ভেঙ্গে দিয়ে নন্দকুমারের অভিযোগপত্র চেপে রাখা যায় না, হেষ্টিংস একথা জানতেন। কাউন্সিলের তিনজন সদস্যই হেষ্টিংসের বিরুদ্ধবাদী, নন্দকুমারের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। যথাসময়ে সংবাদ আসে তাঁরা নন্দকুমারকে নিয়ে কোম্পানীর এটর্ণির বাড়ীতে যাওয়া-

আসা সুরু করেছেন। শীগ্‌গিরই হেষ্টিংসকে সুপ্রীম কোর্টে অভিযুক্ত করা হবে।

লাটবাহাদুর হেষ্টিংস চোখে অন্ধকার দেখেন। বন্ধু গ্রেহামকে তিনি লিখলেন:

Noncoomer has completely crushed me. My position, my fortune, my honour—everything is at stake. I have already formed a resolution to leave India and return to England by the first available ship.

—পদত্যাগ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করা ছাড়া দ্বিতীয় পথ খোলা নেই। নন্দকুমার আমার সর্ব্বনাশ সাধন করেছেন!



নন্দকুমারের বিচার

সারা কলকাতা জুড়ে হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। নন্দকুমার বড়লাট বাহাদুরকে একচালে কাত করেছেন। শীগ্‌গিরই সুপ্রীম কোর্টে হেষ্টিংসের বিচার হবে।

ইউরোপিয়ান ক্লাবে সেদিন সন্ধ্যাবেলা এই নিয়েই তুমুল উত্তেজনা চলছিল। উদ্ধত, দুর্ব্বিনীত, পদগর্ব্বে গর্ব্বিত লাট-বাহাদুর হেষ্টিংস নিজের জাত ভাইদের ভেতর খুব জনপ্রিয় ছিলেন, একথা বলা যায় না। গ্রেহাম, বারওয়েল, ইম্পে প্রভৃতি ইংরাজ—যাঁদের সঙ্গে হেষ্টিংসের স্বার্থের যোগাযোগ ছিল, তাঁরা ছাড়া আর সবাই লাটবাহাদুরকে ঈর্ষ্যার চোখে দেখতেন। হেষ্টিংস লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ খাচ্ছেন, অথচ তাঁরা তেমন কিছুই করতে পারছেন না। ঈর্ষ্যা ত' হওয়ারই কথা।

ক্লাবে, ক্লেবারিং ও মন্‌সন্ বিলিয়ার্ড খেলছিলেন। স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস্ ছুটে এসে বললেন: **Maharaj Noncomer has been arrested this evening!**

ক্লাবে হুলুস্থূল পড়ে গেল। ফ্রান্সিস্ যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তার সারমর্ম্ম এই যে, বুলাকীদাসের নামে দলিল জাল করবার অভিযোগে মহারাজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযোগকারী কে একজন মোহনপ্রসাদ—লাটবাহাদুরের স্তাবক গোষ্ঠীর অন্যতম। এই মোহনপ্রসাদ দু'বছর আগে

সিভিল কোর্টে বুলাকীদাসের দলিল জাল করবার অভিযোগ এনেছিল মহারাজের বিরুদ্ধে। শেঠ বুলাকীদাসের উত্তরাধিকারীদের ভেতর একমাত্র গঙ্গাবিষ্ণুই জীবিত। মোহনপ্রসাদ গঙ্গাবিষ্ণুর আমোক্তার। কিন্তু সিভিল কোর্টে মোহনপ্রসাদের মোকদ্দমা ফেঁসে যায়। নন্দকুমার প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে দলিল জাল করা হয়নি।

আজ সেই পুরাণো অভিযোগে সুপ্রীম কোর্টে মহারাজকে অভিযুক্ত করার পেছনে যে লাটবাহাদুরের অদৃশ্য হাত রয়েছে এ-কথা কে না বুঝতে পারে?

হেষ্টিংসের অসাধ্য কিছুই নেই। আসন্ন বিপদের হাত থেকে মুক্তি লাভের জন্য তিনি যে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে এরকম একটা কোন ব্যবস্থা করবেন, তাতে আর আশ্চর্য্য কি! অদৃষ্টের চাকা ঘুরে গেছে। অভিযোক্তা নন্দকুমার এখন আসামী!

* * * *

কর্ম্মজীবনে নন্দকুমার ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে অনেক প্রভাবশালী লোকের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তাঁরা নন্দকুমারকে পথের কাঁটা বলে মনে করতেন। রাজা নবকৃষ্ণ, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, খোজা পিক্রুস্, সদর উদ্দীন মুন্সী ইঁহাদের অন্যতম। কোন কারণে মোহনপ্রসাদও নন্দকুমারের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়।

নন্দকুমারের সঙ্গে প্রথম যেদিন হেষ্টিংসের বিরোধের সূত্র-

পাত হয়, সেই দিন থেকেই লাট ভবনে, মহারাজের শত্রুদলের লোকেরা প্রতিপত্তি লাভ করল। হেষ্টিংস মোহনপ্রসাদের সঙ্গে খুব দহরম-মহরম করতে লাগলেন।

শেঠ বুলাকীদাসের উত্তরাধিকারী পদ্মমোহন ও পত্নী যতদিন জীবিত ছিলেন, বুলাকীদাসের দলিল জাল, মোহন-প্রসাদ কখনো এ-কথা বলেনি।

তাই ওঁদের মৃত্যুর পর গঙ্গাবিষ্ণুকে সে বোঝাতে লাগল: বুলাকীদাসের দলিল জাল এই মর্ম্মে আদালতে নালিশ করলে, লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার ভয়ে মহারাজ নিশ্চয়ই কিছু টাকা দিয়ে আমাদের সঙ্গে মিটমাট করে ফেলবেন। এই অভাবের সংসারে বেশ কিছু টাকা তুমি পেয়ে যাবে।...

মোহনপ্রসাদের প্রস্তাব গঙ্গাবিষ্ণুর ধর্ম্মবুদ্ধি আচ্ছন্ন করে ফেললে। এতগুলো করকরে টাকা......

কিন্তু সিভিল কোর্টে মহারাজ নন্দকুমারের দিক থেকে মোকদ্দমা মিটমাট করবার কোন আগ্রহই দেখা গেল না। অন্যত্র বলেছি, সিভিল কোর্টে মোহনপ্রসাদের মোকদ্দমা ফেঁসে গেল।

লাট বাহাদুর হেষ্টিংস সেদিন যখন চোখে সর্ষেফুল দেখছিলেন, নন্দকুমারের মারাত্মক অভিযোগের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য পদত্যাগ করে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া যখন তাঁর কোন পথ খোলা নেই, সেই সময় প্রভুর সাহায্যে এগিয়ে এলো মোহনপ্রসাদ।

বড়লাট বাহাদুর! সে বললে: হুজুর ভরসা দিলে শেঠ বুলাকীদাসের দলিল জাল করার অভিযোগে নন্দকুমারকে আমি সুপ্রীম কোর্টে অভিযুক্ত করব। শেঠ বুলাকীদাসের ওয়ারিশদের ভেতরও একমাত্র গঙ্গাবিষ্ণুই জীবিত। গঙ্গাবিষ্ণু আমার হাতের পুতুল। যা বলব, তাই করবে।

রাজা নবকৃষ্ণ সায় দিয়ে বললেন: উত্তম প্রস্তাব। ইংলণ্ডের আইনে জালিয়াতির অপরাধে নন্দকুমারের ফাঁসি পর্য্যন্ত হতে পারে।

গ্রেহাম আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন: The idea!

হেষ্টিংস বললেন: কিন্তু সিভিল কোর্টে জালিয়াতি প্রমাণ হয় নাই।

—তা না হক। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টে ত' জালিয়াতি প্রমাণ হতে পারে?

—But how? কেমন করিয়া?

মোহনপ্রসাদ বললে: এবার হুজুর, সাক্ষী-সাবুদ ঠিক-ঠাক করে নিয়েছি। কমলউদ্দীন আমাদের প্রধান সাক্ষী।

কমলউদ্দীন সেলাম করে বললে: হুজুর, মহারাজ নন্দকুমার বুলাকীদাসের দলিলে আমার শীলমোহর জাল করেছেন—আমি আদালতে সাক্ষী দেব।

হেষ্টিংসের চোখে আশার আলো। বললেন: You? তাহা হইলে তোমার নাম কমল মহম্মদ? Good.

কমলউদ্দীন: কমলউদ্দীন কমল মহম্মদ হবে এ আর বেশী

কথা কি? আমার নাম ত' আমার নাম, লাটবাহাদুরের জন্য বাপের নামও বদলাতে পারি, হ্যাঁ।

রাজা নবকৃষ্ণ বললেন: হুজুর! আমি কোর্টে দাঁড়িয়ে বলব নন্দকুমার শীলাবতের সাক্ষ্য জাল করেছেন।

গঙ্গাগোবিন্দ বললেন: হুজুর, নন্দকুমারের বিরুদ্ধে সাক্ষী-সাবুদের অভাব হবে না। সে সব ব্যবস্থা আমরা করব। নন্দকুমার শুধু হুজুরের শত্রু নয়, আমাদেরও শত্রু। শত্রুকে নিপাত করতেই হবে।

কান্তমুদী বললেন: নিশ্চয়ই কিন্তু লাটবাহাদুর, জজ ও জুরীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হুজুরকেই বলতে হবে।

হেষ্টিংস: নিশ্চয়ই। প্রধান বিচারপতি স্যার এলাইজা ইম্পে আমার বাল্যবন্ধু। মোহনপ্রসাদ যাহাতে ন্যায়বিচার পায় হামি ইম্পেকে অনুরোধ করিবে।

রাজা নবকৃষ্ণ: তাহলে আর দেরী করা কেন মোহন-প্রসাদ···শুভস্য শীঘ্রং।

মোহনপ্রসাদের অভিযোগে প্রধান বিচারপতি ইম্পে সেইদিনই মহারাজ নন্দকুমারকে গ্রেপ্তার করে জেল-হাজতে রাখলেন। জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করা হল।

হাজতে খাদ্যাখাদ্য বিচারে কর্ত্তৃপক্ষ নন্দকুমারের স্বাধীনতা হরণ করতে চেষ্টা করলেন। নন্দকুমার উপায়ান্তর না দেখে অনশন সুরু করলেন।

সত্তর বছর বয়স্ক বৃদ্ধ নন্দকুমার চারদিন চাররাত জল

স্পর্শ করলেন না। কর্তৃপক্ষ শেষ পর্য্যন্ত তাঁর দাবী মানতে বাধ্য হলেন।

লাটবাহাদুর হেষ্টিংস ও প্রধান বিচারপতি ইম্পের ষড়্-যন্ত্রের কথা সারা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়ল। সবাই কানা-ঘুষা করতে লাগল যে জালিয়াতির অভিযোগ একবার প্রমাণ করতে পারলেই হয়। নন্দকুমারকেও ওরা ফাঁসিগাছে ঝুলাবে।

মহারাজ নন্দকুমারের পরিবারে বিষাদের ছায়া নামল। অন্দর-মহলে মেয়েরা কান্নাকাটি করতে লাগল। ভয়ে ও ভাবনায় ক্ষেমঙ্করীর চোখের জল শুকিয়ে গেছে। প্রতিদ্বন্দ্বী নন্দকুমারকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে সরাবার জন্য হেষ্টিংস প্রাণপণ চেষ্টা করবেন, ক্ষেমঙ্করী এ-কথা জানেন। তবু মনে ক্ষীণ আশা জাগে, মহারাজ ত' সত্যিই জাল-জোচ্চুরি করেননি!

ক্ষেমঙ্করী রাতদিন গৃহদেবতার পদতলে বসে প্রার্থনা করতে লাগলেন—ঠাকুর! আমার স্বামীকে রক্ষা কর ঠাকুর! সারা-জীবন কায়মনোবাক্যে তোমার সেবা করে এসেছি। কোন দিন কিছু চাইনি। আজ আমার স্বামীর জীবন ভিক্ষা চাইছি। আমার স্বামীকে রক্ষা কর ঠাকুর!

এতবড় বিপদ মাথায় নিয়েও কিন্তু মহারাজ নন্দকুমার অবিচলিত চিত্ত, স্থির, শান্ত রইলেন। আত্মীয়-বন্ধুদের তিনি সান্ত্বনা দিলেন: বৃদ্ধ হয়েছি, ওপারের ডাক এল বলে। এই বয়সে, মিথ্যা মামলায় জালিয়াৎ জোচ্চর প্রতিপন্ন হয়ে ফাঁসি-গাছে ঝুলবার বরাতই যদি আমার থাকে, কে খণ্ডাতে পারে

তা ? বিধিলিপি কেউ খণ্ডাতে পারে না। গুরুদেব আমাকে বহুদিন আগেই এ বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন। এ-ও তিনি বলেছিলেন, নিয়তি কেন বাধ্যতে।…তবু ভাল যে লাটবাহাদুর আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়েছেন !

জামাতা রাধাচরণ বললেন : কমলউদ্দীন ওদের প্রধান সাক্ষী। আদালতে দাঁড়িয়ে হলফ করে সে বলবে, সেই নাকি স্বর্গত কমল মহম্মদ। বুলাকীদাসের দলিলে আপনি তার শীলমোহর বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করেছেন।

নন্দকুমার মৃদু বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন : কমল এ-কথা বলবে ?

—ওদের অন্যান্য সাক্ষী রাজা নবকৃষ্ণ, খোজা পিত্রুস্, মুন্সী সদরউদ্দীন। মহারাজের প্রতি এদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত আক্রোশ রয়েছে।

নন্দকুমার : পদ্মমোহন আজ বেঁচে থাকলে মোহনপ্রসাদ ও গঙ্গাবিষ্ণু ও আমার নামে জালিয়াতির মামলা আনতে সাহস করত না। কিন্তু…আমি তাই শুধু ভাবি, এত বড় মিথ্যাচার ওদের সইবে ?

মহারাজ নন্দকুমার ফারার নামে জনৈক নবীন ইংরাজ আইনজীবীকে উকীল নিযুক্ত করেছিলেন। ফারার বললেন : Don't you worry. হামি ইহাদের মুখোস খুলিয়া দিবে। প্রমাণ করিবে, হাপনি নির্দ্দোষ। হাপনি অবশ্যই মুক্তি পাইবেন।

মহারাজ হাসলেন : মুক্তি ! না সাহেব ! স্বর্গত কমল

মহম্মদকে ওরা যখন কবর থেকে তুলে এনে কমলউদ্দীন করে দাঁড় করিয়েছে আমার বিপক্ষে, মুক্তি পাবার ভরসা রাখিনে।

* * *

অবশেষে নন্দকুমারের বিচারের দিন এল। ভোর থেকে আদালতের সামনে এসে লোক জড় হতে লাগল। আদালতের ভেতরে দর্শকদের স্থান লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠেছে।

জুরীদের জায়গায় বার জন অজ্ঞাতকুলশীল শ্বেতাঙ্গ এসে বসলেন। তিনজন জজ—হাইড্, লেমিষ্টার ও স্যার এলাইজা ইম্পে। মাথায় পরচুলা, হাতে হাতমোজা ও গায়ে সাধারণ পোষাকের উপর লাল রংএর আলখাল্লা পরে তাঁরা নিজেদের জায়গায় বসেছেন। তাঁদের পিছনে দাঁড়িয়ে দু'জন কালা সিপাই দু'খানি ময়ূরপুচ্ছ পাখা ব্যজন করছে।

আদালতের দোভাষী ইলিয়ট্ জুরীদের পাশেই একখানি কুর্সিতে বসলেন। আসামীপক্ষের উকিল ফারার ও তাঁর সহযোগীরা, সরকার পক্ষের উকিল হেমিলটন ও তাঁর সহযোগীরা—পেস্কার, মুহুরী, পেয়াদা, প্রত্যেকে নিজেদের জায়গায় উপবিষ্ট।

একপাশে আসামীপক্ষের সাক্ষীরা ও অন্যপাশে ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীরা বসে। দরজার একপাশে একদল গোরা সিপাই দাঁড়িয়ে। সকাল আটটা থেকে রাত দুটো তিনটে অবধি প্রত্যহ বিচার-সভার কাজ চলতে লাগল।

প্রথমেই আসামীপক্ষের উকিল উঠে দাঁড়ালেন: Your

Lordships! তিনি বলতে লাগলেন : এইসব অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশী জুরী—যারা এদেশের ভাষা, রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ—এদের পরিবর্তে এতদ্দেশীয় সম্মানিত ব্যক্তিরা জুরীদের আসন অলঙ্কৃত করুন, ইহাই আমার মক্কেলের প্রার্থনা।

প্রধান বিচারপতি : তাহাতে কিছু আসিয়া যাইবে না। আমাদের দোভাষী মিষ্টার ইলিয়ট্ জুরীদের সাহায্য করিবেন।

মিঃ ফারার : যেহেতু মিঃ ইলিয়টের সঙ্গে মহারাজের শত্রুদলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে, আমার মক্কেল প্রার্থনা করিতেছেন, ইলিয়টের বদলে অন্য কোন দো-ভাষী নিযুক্ত করা হোক।

প্রধান বিচারপতি : এ বিষয় জুরীগণ যাহা সিদ্ধান্ত করিবেন তাহাই হইবে। তাঁহারা যদি মিঃ ইলিয়টের দক্ষতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ থাকেন, ইলিয়টই দোভাষীর কার্য্য করিবেন।

জুরীদের দলপতি : Your Lordships! ইলিয়টের দক্ষতা সম্বন্ধে আমরা সন্দেহবান।

ইলিয়ট : Your Lordships! আমি দোভাষীর কাজ করব না।

প্রধান বিচারপতি : হামি কাহারো কথা শুনিব না। হাপনি দো-ভাষীর কাজ অবশ্য করিবে।

পেছন থেকে গোরা-সিপাইরা চেঁচাতে লাগল : Mr. Eliot must interpret!

জুরীদের দলপতি বুঝতে পারেন, ইলিয়টের সম্বন্ধে আপত্তি করা মোটেই সমীচীন হয়নি। তাড়াতাড়ি নিজের ভুল শুধ'রে নেন তিনিঃ মিঃ ইলিয়ট অবশ্যই দো-ভাষীর কাজ করিবেন। তিনি এ-কাজে অতিশয় দক্ষ।

নিজের চেয়ারে বসে নন্দকুমার সবই দেখছিলেন। জুরীদের দলপতির ডিগ্‌বাজী খাওয়ার নমুনা দেখে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না।

সুরু হল জবানবন্দী।

কমলউদ্দীন হলফ নিয়ে কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়াল। মিঃ ফারার তাকে জেরা সুরু করলেন।

ফারার: হাপনার কি নাম আছে?

কমল: আমার নাম? বিবেচনা করুন, আমার নাম কমল-উদ্দীন খাঁ।

ফারার: হাপনি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে, হাপনার নাম কমলউদ্দীন খাঁ?

কমল: বিবেচনা করুন, বাপের নাম ভুলতে পারি, তা বলে নিজের নাম ভুলে যাব? সে কি কখনো হয় হুজুর?

ফারার: তাহা হইলে আপনি মহম্মদ কমল নন?

কমল: আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই ত' মহম্মদ কমল। বিবেচনা করুন, আগে আমার অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। তাই নাম ছিল মহম্মদ কমল। আজকাল বিবেচনা করুন, দু'পয়সা রোজগার করছি, বিবেচনা করুন, লাট সাহেবের দৌলতে, সিঙ্গি

মশাইর দৌলতে, নূনের কারবারটা বেশ জাঁকিয়ে বসেছি। তাই নামটাও, বিবেচনা করুন, পালটে গেল। মহম্মদ কমল এখন কমলউদ্দীন খাঁ। বিবেচনা করুন, আমারই শীলমোহর মহারাজ নন্দকুমার বুলাকীদাসের জাল দলিলে ব্যবহার করেছেন।

ফারার ঃ মহারাজ হাপনার শীলমোহর কোথায় পাইল ?

কমল ঃ সে এক ইতিহাস। নবাব মীরজাফর কোন কারণে, বিবেচনা করুন, আমার উপর অসন্তুষ্ট হন। আমার ভয় হয় নবাব আমাকে জেলে দিবেন। আমি নন্দকুমারের শরণাপন্ন হই। নবাবের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করে নন্দকুমার আমার নামে একখানি আর্জ্জি লিখে দিতে রাজী হন। সেই উপলক্ষে আমি নন্দকুমারকে আমার শীলমোহর দিয়েছিলাম। আমাকে না জানিয়ে মহারাজ আমার শীলমোহর বুলাকীদাসের জাল দলিলে ব্যবহার করলেন ! আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি, মহারাজ নন্দকুমার এই সামান্য টাকার জন্য এতবড় বেইমানিটা করতে পারেন !

ফারার ঃ That's not true. ইহা সত্য নহে। বুলাকীদাসের দলিলের সাক্ষী হাপনি নন। সাক্ষী কমল মহম্মদ অন্য ব্যক্তি। অনেকদিন হইল কমল মহম্মদ মারা গিয়াছে !

কমলউদ্দীন থতমত খেয়ে গেল। ফরিয়াদী পক্ষের উকিল হেমিলটন বাধা দিলেন ঃ Your Lordships ! আসামী পক্ষের উকিল হামার সাক্ষীকে ধমক দিয়া confuse করিবার চেষ্টা করিতেছেন। I object.

প্রধান বিচারপতি : Objection granted.

ফারার : That's all. এই পর্য্যন্ত।

মিঃ ফারার বসে পড়লেন। মিঃ হেমিলটন তখন জেরা সুরু করলেন।

হেমিলটন : কমল মহম্মদ! হাপনি কখন জানিতে পারিল মহারাজ নন্দকুমার হাপনার শীলমোহর বুলাকীদাসের জাল দলিলে ব্যবহার করিয়াছে?

কমল : বিবেচনা করুন, মোহনপ্রসাদজীর মুখে আমি প্রথম এ খবর পাই। খবর পেয়েই মহারাজের কাছে ছুটে গেলাম। বললাম, বিবেচনা করুন, এ কি করছেন মহারাজ! তখন মহারাজ, বিবেচনা করুন, আমার হাত ধরে বললেন, আমার হয়ে তোমাকে সাক্ষী দিতেই হবে।

হেমিলটন : তখন হাপনি কি বলিল?

কমল : বললাম, বিবেচনা করুন, মহারাজ! আপনার জন্য সব করতে পারি। কিন্তু ধর্ম্মভ্রষ্ট হতে পারি না। বিবেচনা করুন, আদালতে আমি সত্যি কথাই বলব। শেঠ বুলাকীদাসের নামে আপনি দলিল জাল করেছেন।

হেষ্টিংসের ভাড়াটে লোকেরা দর্শকদের গ্যালারি থেকে চেঁচাতে সুরু করে : জালিয়াৎ! জোচ্চর।

গোরা সিপাইরা চেঁচাতে লাগল : Hang him!

প্রধান বিচারপতি টেবিলে আঘাত করতে লাগলেন : Silence! Silence!

হেস্টিংস: That's all for the present. কমল মহম্মদ হাপনি বসিতে পারে।

*　　　*　　　*

গ্রীষ্মের অসহ্য উত্তাপ। সবাই ঘেমে নেয়ে উঠছে। দড়ি-টানা পাখা তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। মাথায় পরচুলা, হাতে হাতমোজা, পায়ে বুট, গায়ে আলখাল্লা পরে বিচারপতিদেরই সবচেয়ে বেশী অসুবিধে হচ্ছে। প্রতি আধঘণ্টা অন্তর এক এক করে সাজঘরে গিয়ে তাঁরা পোষাক বদলে ফিরে আসছেন।

দর্শকেরাও দল বেঁধে মাঝে মাঝে বাইরে বেরিয়ে এসে লালদীঘি থেকে আঁজলা ভরে জল নিয়ে মাথায়, মুখে ছিটিয়ে দিচ্ছে।

আসামী পক্ষের উকিল মিঃ ফারার তখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন: Your Lordships! Here are some documents, I would like to explain. এই চিঠি শেঠ বুলাকীদাস মহারাজ নন্দকুমারকে লিখিয়াছিল। ইহাতে কোম্পানীর বণ্ড ও মহারাজের জহরতের উল্লেখ আছে। Here is another. এই হিসাব-পত্রে মোহনপ্রসাদ ও গঙ্গাবিষ্ণু late পদ্মমোহন দাসের সঙ্গে সহি করিয়াছিল। ইহাতে নন্দকুমারের টাকা ও কোম্পানীর কাগজের উল্লেখ আছে! Here is a third paper. বুলাকীদাসের নিজের হাতে লেখা। ইহাতে মহারাজের সঙ্গে দেনা-পাওনার হিসাব পরিষ্কারভাবে লিখিত আছে। এই হিসাব ledger book,

that is কড়ারনামায় লিখিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, ফরিয়াদী পক্ষ কড়ারনামা হারাইয়া ফেলিয়াছে।...Your Lordships! These documents are positive proof of the innocence of my client.

ফারার কাগজগুলো জজেদের টেবিলে রাখলেন। কিন্তু জজেরা তেমন আগ্রহ দেখালেন না। ফারার বলতে লাগলেন: Your Lordships! হামি এখন আসামী পক্ষের সাক্ষীদের জেরা করিব।

প্রথমেই তেজরায়কে ডাকা হল। তিনি বললেন: দলিলের অন্যতম সাক্ষী মহতাব রায় আমার সহোদর। মহতাব রায় আজ প্রায় আড়াই বছর হল, ৺ঈশ্বরলাভ করেছেন। আমাদের পিতামহ হুগলীতে বসবাস করতেন। মানকরে আমাদের কারবার ছিল।

ফারার: (দলিল দেখিয়ে) এই শীলমোহর হাপনি চিনতে পারে?

তেজরায়: পারি। এ আমার দাদা ৺মহতাব রায়ের শীলমোহর! দাদার শীলমোহর আমি জানি। অন্যান্য দলিলে এই শীলমোহর আমি দেখেছি।

প্রধান বিচারপতি: এই মহতাব রায় হাপনার দাদা, তাহার কি প্রমাণ হাপনি দিতে পারে?

প্রশ্নটা এমনি অবান্তর যে তেজরায় থতমত খেয়ে যান। প্রধান বিচারপতি তখন তাকে বসবার জন্য ইঙ্গিত করেন।

পরক্ষণেই ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষী কাশীনাথ ও হুজরীমলকে ডাকা হল, তেজরায়কে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করবার জন্য।

কাশীনাথ হলফ করে বললেন: ৺মহতাব রায়কে আমি জানতাম। তিনি এই সাক্ষী তেজরায়ের ভাই নহেন। তাহার অনেক বয়স হয়েছিল।

হুজরীমল বললে: ৺মহতাব রায়কে আমি ভাল করে জানি। বুলাকীদাসের দলিলে তিনি শীলমোহর করেননি।

* * *

......রাজপথে গোধূলির ছায়া নামছে। পেয়াদা ও অন্যান্য ভৃত্যেরা এসে আদালত-গৃহের ঝাড়লণ্ঠন ও অন্যান্য প্রদীপগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। আলোছায়ায় আদালত-গৃহ রহস্যময় হয়ে উঠে।

আসামী পক্ষের সাক্ষী বর্দ্ধমানের রাণীর পেস্কার রূপনারায়ণ চৌধুরী তখন সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন।

—৺মহতাব রায় আমার বিশেষ পরিচিত। তেজরায় ও মহতাব রায় দুই সহোদর। মহতাব রায়ের শীলমোহর দেওয়া একখানি চিঠি আমার নিকট আছে। বুলাকীদাসের অঙ্গীকার-পত্রের সাক্ষী যে ইনিই, শীলমোহর মিলিয়ে দেখলেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

রূপনারায়ণ চিঠিখানি ফারারের হাতে দিলেন। ফারার চিঠিখানি জজেদের টেবিলে রাখলেন।

ফারার ঃ বুলাকীদাসের অঙ্গীকার-পত্র সম্পর্কে হাপনি যাহা জানেন বলুন।

রূপনারায়ণ ঃ বুলাকীদাসের আদেশে, তাহার মুহুরী দলিল-খানি লেখেন। সে-সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। দলিলে সাক্ষী ছিলেন শীলাবত, মহতাব রায়, মহম্মদ কমল। এরা কেউ-ই আজ আর বেঁচে নেই।

ফারার ঃ দলিলের সাক্ষী কমল মহম্মদ ও কমলউদ্দীন কি এক ব্যক্তি ?

রূপ ঃ নিশ্চয়ই না। কমল মহম্মদকে আমি জানতাম। প্রায় পাঁচ বছর আগে তিনি মারা গেছেন। তাঁর মৃতদেহ গোরস্থানে নিয়ে যেতে আমি দেখেছি।

* * *

......দূরে কেল্লার চূড়ায় মধ্যরাত্রির বিউগল বেজে উঠল। ক্রমেই রাত বাড়ছে। জুরীরা ঘুম চোখে চেয়ারে ঢুলছেন। দর্শকদের গ্যালারি ক্রমেই ফাঁকা হয়ে আসছে। উকিল, মুহুরী, পেয়াদা, সিপাই সবাই ঘুমে ঢুলু ঢুলু। সারাদিনের পরিশ্রমের পর তারা আর চোখ মেলে চাইতে পারছে না। ক্লান্তিতে অবসাদে ভেঙ্গে আসছে দেহ। এমন কি বিচারপতিরাও তার ব্যতিক্রম নন।

প্রধান বিচারপতি যেন আদালত-গৃহের ঘুম ভাঙ্গাবার জন্যই টেবিলে আঘাত করতে লাগলেন ঃ **Silence ! Silence ! Gentlemen, I say, silence !**



ভারতের যাহা কিছু পবিত্র ও সম্মান্ত তা'র অপমান করে হেস্টিংসের প্রতিদ্বন্দ্বী নন্দকুমারকে

জজ, জুরী, উকিল, সাক্ষী সবাই নিজেদের জায়গায় সোজা হয়ে বসল, চোখ মেলে তাকিয়ে।

আসামীপক্ষের সাক্ষী শেখ ইয়ার মহম্মদ তখন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন।

—হ্যাঁ, আমি কমল মহম্মদকে জানতাম। তিনি আমার বিশেষ পরিচিত ছিলেন। শেঠ বুলাকীদাসের অঙ্গীকারপত্রে তিনি যখন শীলমোহর করেন, আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ...হ্যাঁ, কোন বিশেষ কাজে আমি শেঠ বুলাকীদাসের সঙ্গে সেদিন দেখা করতে গিয়েছিলাম। কমলউদ্দীন ও কমল মহম্মদ বিভিন্ন ব্যক্তি, ভিন্ন জায়গার অধিবাসী। কমল মহম্মদ আজ প্রায় পাঁচ বছর আগে মারা গেছেন। আমি নিজে তাঁকে কবর দিয়েছি।

প্রধান বিচারপতি ঃ That's not true. আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার শাস্তি কি হাপনি জানেন ?

শেখ ইয়ার ঃ না। জানবার প্রয়োজন আছে বলেও আমি মনে করি না। কেননা আমি যা বলেছি তার একবর্ণও মিথ্যা নয়। ~শেঠ বুলাকীদাসের অঙ্গীকারপত্র সাচ্চা। মহারাজ নন্দকুমার, যাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ষাট লক্ষ টাকার উপর, মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকার জন্য তিনি তাঁর এককালীন অনুগৃহীত শেঠ বুলাকীদাসের নামে দলিল জাল করবেন, এ-ও কি সম্ভবপর ?

হেমিলটন্ ঃ বক্তৃতা রাখুন।

* * *

…নিশুতি রাতের স্তব্ধতা ভেদ করে দূরে গীর্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত তিনটে বাজল।

এমনি ভাবে দিনের পর দিন সকাল আটটা থেকে রাত তিনটে অবধি চলল মহারাজ নন্দকুমারের বিচার-প্রহসন। অসহ্য গ্রীষ্মে ম্রিয়মাণ জজেরা ক্লান্ত, বিরক্ত। ভাড়াটে জুরীরা অধিকাংশ সময়ই তন্দ্রাচ্ছন্ন। উকিল, পেস্কার, মুহুরী, পেয়াদা সবাই ক্লান্ত। গোরা-সিপাইরা মাঝে মাঝে চেঁচায়; তারপর আবার ঝিমিয়ে পড়ে। শুধু নন্দকুমার শান্ত, স্থির! চোখে তাঁর তন্দ্রা নেই, দেহে নেই ক্লান্তি। অবিচলিত চিত্তে তিনি বিচার-প্রহসনের দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলেন। প্রতিবারেই জজেরা আসামীপক্ষের সাক্ষীদের প্রতি রূঢ়, অভদ্র ব্যবহার করতে থাকেন। ব্যাপারটা নন্দকুমারের দৃষ্টি এড়ায় না।

সেদিন তিনি মিঃ ফারারকে ডেকে বললেন: মিঃ ফারার, আমার সাক্ষীদের প্রতি জজেদের রূঢ় আচরণ থেকে আমার ভয় হচ্ছে, এ বিচার শেষ পর্য্যন্ত একতরফা প্রহসনে দাঁড়াবে। এ অবস্থায়, আমি আর আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চাই না। আপনি ওঁদের জানিয়ে দিন।

মিঃ ফারারও যে জজেদের বৈষম্যমূলক আচরণ লক্ষ্য করেননি, তা নয়, তবু তিনি নন্দকুমারকে ভরসা দিয়ে বললেন: ভগবান হামাদের। হাপনি নির্দ্দোষ; অবশ্যই

মুক্তি পাইবেন। আত্মপক্ষ সমর্থন হইতে বিরত হওয়ার কল্পনা ত্যাগ করুন।

* * *

বিরামবিহীন দিবারাত্রির এই বিচার-সভার কাজে সবাই ক্লান্ত। বিশ্রাম গ্রহণ করবার মত সময়ও নেই। ভোর রাত্রে আদালত ভাঙ্গে আবার সকাল আটটা বাজতে না বাজতেই কাজ সুরু হয়। কিন্তু প্রধান বিচারপতি স্যার এলাইজা ইম্পে উপাসনার দিন রবিবারেও আদালতের কাজ বন্ধ করলেন না। নন্দকুমারের বিচার-সভার কাজ শেষ না করে কেউ বিশ্রাম নিতে পারবেন না। রায় যেদিন বেরোবে, সেদিন ছুটী।

সাক্ষীর পর সাক্ষী কাঠগড়ায় উঠে এসে দাঁড়ায়। পূবের সূর্য্য পশ্চিমে হেলে পড়ে, নামে গোধূলির ছায়া রাজপথে! আদালত-গৃহের ঝাড়-লণ্ঠনগুলো জ্বলে উঠে। মৃত্যুপুরীর রহস্য নামে আলোছায়াময় আদালত গৃহে। গীর্জ্জার ঘড়িতে বারোটা বাজে। রাত বারোটা না দিন বারোটা বাজল?... কোর্টে মধ্যরাত্রির বিউগল্ বাজল। আদালত তন্দ্রাচ্ছন্ন। Silence! Silence! প্রধান বিচারপতি ঘুমচোখে চেঁচিয়ে উঠেন।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষী রাজা নবকৃষ্ণ।

প্রধান বিচারপতি ঃ রাজা নবকৃষ্ণ! হাপনি বুলাকীদাসের দলিল দেখিয়াছে। হাপনার কি ধারণা ঐ স্বাক্ষর শীলাবত নিজে করিয়াছে?

নবকৃষ্ণ ঃ না। শীলাবতের স্বাক্ষর আমি জানি। শীলাবত আমাকে ও ক্লাইব সাহেবকে অনেক চিঠি লিখেছে। শীলাবতের হাতের লেখা অমন সুন্দর ছিল না।

হেমিলটন্ ঃ হাপনি কি মনে করে ঐ দলিলে শীলাবতের স্বাক্ষর জাল করা হইয়াছে ?

নবকৃষ্ণ ঃ আমার উপর একজন ব্রাহ্মণের জীবন-মরণ নির্ভর করছে। কিন্তু আমি মিছে কথা বলব না। হ্যাঁ, শীলাবতের ঐ স্বাক্ষর জাল !

ফারার ঃ রাজা নবকৃষ্ণ ! একথা কি সত্যি, মহারাজ নন্দকুমারের সহিত হাপনার ব্যক্তিগত শত্রুতা আছে ?

প্রধান বিচারপতি ঃ এ প্রশ্ন অবান্তর।

ফারার ঃ **Your Lordships ! I beg to withdraw the question.**

* * *

…এমনিভাবে সাতদিন সাতরাত কাটিয়ে নন্দকুমারের বিচার-প্রহসনের অষ্টম রজনী এল। মিঃ ফারার মোহন-প্রসাদকে শেষবারের মত জেরা করতে লাগলেন। মহারাজ নন্দকুমারের যে খতিয়ানে মোহনপ্রসাদ ও গঙ্গাবিষ্ণু সই করেছিল সেটা সামনে ধরে ফারার বললেন ঃ মোহনপ্রসাদ ! হাপনি এই হিসাব-পত্র পূর্ব্বে দেখিয়াছে ?

মোহনপ্রসাদ নিরুত্তর।

ফারার : ইহাতে মোহনপ্রসাদ সহি আছে। এ সহি কি হাপনার ?

মোহনপ্রসাদ নির্ব্বাক।

ফারার : Say 'Yes' or 'No', হামার কথার উত্তর দিন। এ সহি কি হাপনার ?

মোহনপ্রসাদ ইতস্ততঃ করে বললে : হ্যাঁ।

ফারার : হাপনি বলিতেছেন বুলাকীদাসের অঙ্গীকারপত্র জাল। ইহা জানিয়াও হাপনি মহারাজের খতিয়ানে কেন সহি করিল ?

মোহনপ্রসাদ : সত্যি বলতে কি, এই হিসাবটা সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা ছিল না। একদিন পদ্মমোহন এসে বললেন, মহারাজের হিসাবের খাতায় আমার সই করা হয়নি শুনে বুলাকীদাসের বিধবা পত্নী দুঃখিত হয়েছেন। আমি তখন পদ্মমোহনকে বললাম : কিসের হিসাব, কি বৃত্তান্ত সব না জেনে সই আমি করতে পারব না। আমার কথা শুনে পদ্ম-মোহন মিনতি করতে লাগলেন ; তুমি সহি করলে বিধবার মনে যদি শান্তি হয়, সইটা করে দেওয়া উচিত নয় কি তোমার ? পদ্মমোহনের বিশেষ অনুরোধে আমি সই করেছিলাম।

ফারার : That's lame excuse. হাপনি কখন কি অবস্থায় এই হিসাব-পত্রে সহি করিয়াছিল ?

মোহনপ্রসাদ : কোম্পানী থেকে মহারাজ যেদিন bond-গুলো নিয়েছিলেন তার ১৮।২০ দিন বাদে।

ফারার : মহারাজের সম্মুখে দলিলের হিসাব-পত্র settle করা হইয়াছিল কি ?

মোহনপ্রসাদ : না।

ফারার : That's all. হাপনি বসিতে পারে।

এরপর আসামীপক্ষের সাক্ষী চৈতন্যনাথ, কখন কি অবস্থায় মোহনপ্রসাদ ও গঙ্গাবিষ্ণু মহারাজের হিসাব-পত্রে সহি করিয়াছিল, ফারার সাহেবের জেরার উত্তরে বিশদভাবে বর্ণনা করলেন।

...রোজকার মত আজও কেল্লায় মধ্যরাত্রির সঙ্কেতসূচক বিউগল্ বেজে উঠল। দর্শকদের গ্যালারি কিন্তু আজ পরিপূর্ণ। নন্দকুমারের বিচার আজই শেষ হবে, কথাটা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। তাই আজ দর্শকেরা কেউ ঘরে ফিরে যায়নি। আশ্চর্য্য ! কারও চোখে আজ তন্দ্রালুতাও নেই।

অবশেষে ফারার সাহেবের অনুরোধে ফরিয়াদি পক্ষের সাক্ষী কেষ্টজীবনকে শেষবারের মত কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হল। জেরার উত্তরে সে বললে : আজ্ঞে হ্যাঁ, কড়ারনামায় আমি নন্দকুমারজীর পাওনা টাকার হিসাব লিখেছিলাম। পদ্মমোহন, গঙ্গাবিষ্ণু ও মোহনপ্রসাদের আদেশেই লিখেছি।

সহসা মোহনপ্রসাদের দিকে দৃষ্টি পড়তেই কেষ্টজীবন থতমত খেয়ে গেল। মোহনপ্রসাদ ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিল।

প্রধান বিচারপতি : মোহনপ্রসাদ হাপনাকে এই হিসাব লিখিতে আদেশ করিয়াছিল।

কেষ্টজীবন : আজ্ঞে, ঠিক তা নয়। মোহনপ্রসাদ সে সময় উপস্থিত ছিলেন না।

ফারার : শেঠ বুলাকীদাসের অঙ্গীকার-পত্র হাপনি দেখিয়াছে ?

কেষ্টজীবন : আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমার সামনেই সেই দলিল লেখা হয়।

প্রধান বিচারপতি : বুলাকীদাস সেখানে উপস্থিত ছিলেন ?

কেষ্টজীবন : বুলাকীদাস উপস্থিত ছিলেন কি না আমার মনে পড়ছে না।

হেমিলটন্ : তিনি উপস্থিত ছিলেন না, কারণ তিনি তখন মৃত।

কেষ্টজীবন : আজ্ঞে, হ্যাঁ হুজুর।

প্রধান বিচারপতি : This is no evidence !

সাক্ষীদের জবানবন্দী এখানেই শেষ হল। আলোচনা করতে জজেরা ভেতরে গেলেন। আদালতে তুমুল উত্তেজনা। আজ রাতেই রায় বেরোবে। নন্দকুমার শান্ত, অবিচলিত। নিজের জায়গায় তিনি চুপ করে বসে আছেন। মুখে উদ্বেগের দুশ্চিন্তার চিহ্নমাত্র নেই।

ক্লান্ত অবসন্ন ফারার সাহেব আর দাঁড়াতে পারছেন না। এই ক'দিন ভদ্রলোক আদৌ বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারেননি। টলতে টলতে নিজের চেয়ারে গিয়ে তিনি টেবিলের উপর শুয়ে পড়লেন।

অবশেষে প্রধান বিচারপতি জুরীদের উদ্দেশে ভাষণ পাঠ করতে লাগলেন। তাঁর একতরফা ভাষণ শুনে জুরীদের এমন কি দর্শকদেরও বুঝতে বাকী রইল না তিনি কি চান। তিনি তাঁর ভাষণে বারবার একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে লাগলেনঃ মোহনপ্রসাদের মত ভদ্রলোক আর হয় না! আপনারা সবাই মোহনপ্রসাদকে জানেন। তাঁর মত সচ্চরিত্র ব্যক্তির পক্ষে কোন নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে মিথ্যা মামলায় জড়িত করা আদৌ সম্ভব কি না, আপনারাই বিবেচনা করুন।···এই মোকদ্দমার আসামী মহারাজ নন্দকুমার একজন পদস্থ ব্যক্তি। তাঁর খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও প্রভাবের কথা ভেবে আপনারা মোহন-প্রসাদের প্রতি অবিচার করবেন না। অপরাধ যে করবে, তাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে, তা সে যতই প্রভাবশালী ব্যক্তি হোক না কেন। আপনারা একথাও ভেবে দেখবেন, আসামী নির্দ্দোষ প্রমাণ হলে অভিযোগকারী মোহনপ্রসাদের কি অবস্থা হবে! ইত্যাদি···

মিঃ ফারার টেবিলে পড়ে নাক ডাকাচ্ছেন। তাঁর মুহুরী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল।

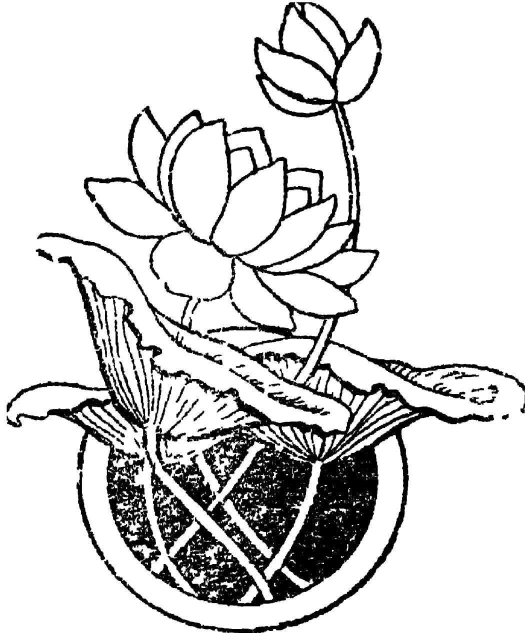
মিস্টার ফারার! মিস্টার ফারার! সে চেঁচাতে লাগলঃ মিস্টার ফারার! সর্ব্বনাশ হয়েছে।

ফারার চোখ মেলে তাকালেন। মুহুরী বললেঃ মিঃ ফারার, মহারাজের ফাঁসির হুকুম হয়েছে।

ফারার লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, what! ফাঁসি! ফাঁসি

নহে murder খুন। It is a judicial murder. God forgive the sinners.

ফারার মেঝেয় হাঁটু গেড়ে বসে বুকে ক্রশ চিহ্ন অঙ্কিত করেন।



নন্দকুমারের ফাঁসি

—জয় লাটবাহাদুরের জয়!

—জয় প্রধান বিচারপতি বাহাদুরের জয়!

হেষ্টিংসের অনুগত বন্ধুবান্ধব ও স্তাবকের দল লাটভবনে মিলিত হয়ে আনন্দোৎসব সুরু করেছে আজ। লাটবাহাদুর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিরকালের জন্য জব্দ করেছেন। আনন্দ কর! ফূর্ত্তি কর।

আজকের উৎসবের আর একটা বিশেষ উপলক্ষও ছিল। বস্তুতঃ পক্ষে লাটভবনে আজ ফিরিঙ্গীদের চেয়ে nativeদের ভীড় বেশী। প্রধান বিচারপতি স্যার এলাইজা ইম্পে বাহাদুর মহারাজ নন্দকুমারের বিচার-ব্যাপারে যে বুদ্ধিমত্তা, ন্যায় ও সত্য-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন, সেজন্য রাজা নবকৃষ্ণ, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রমুখ লাটসাহেবের স্তাবকেরা তাঁকে আজ একখানি মান-পত্র দান করবেন!

হেষ্টিংসের ইঙ্গিতে রাজা নবকৃষ্ণ মান-পত্রখানি পাঠ করলেন:

"মাননীয় প্রধান বিচারপতি

স্যার এলাইজা ইম্পে বাহাদুর!

হে প্রভু! আপনাদের আগমনে আমরা উল্লসিত ও আপনাদের বিচার-শক্তি দেখিয়া পরম আনন্দে নিমগ্ন হইয়াছি। এক্ষণে ভগবান আপনাদের জীবিত রাখিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করুন।" ইত্যাদি

রাজা নবকৃষ্ণ মান-পত্রখানি প্রধান বিচারপতির হাতে দিতেই, স্তাবকের দল চেঁচাতে লাগল : জয় প্রধান বিচারপতি বাহাদুর কি জয়!

হেষ্টিংস বললেন : নন্‌কুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশ মকুব করিবার জন্য নবাব ইংলণ্ডে রাজার নিকট অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

ইম্পে : He should not have done it.

হেষ্টিংস : নবাব হামাকে লিখিয়াছেন, যতদিন না ইংলণ্ডেশ্বরের আদেশ আসে, নন্‌কুমারের ফাঁসি স্থগিত রাখুন।

রাজা নবকৃষ্ণ : তা নন্দকুমারকে নিয়ে নবাব মোবারকদ্দৌল্লার অত মাথাব্যথা কেন?

গঙ্গা গোবিন্দ : উনি অনুরোধ করলেই বা লাট বাহাদুর নন্দকুমারের ফাঁসি স্থগিত রাখবেন কেন?

* * *

যথাসময়ে রাজা গুরুদাস ও নবাবের নিকট খবর এল, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট তারিখেই মহারাজের ফাঁসি হবে। লাটবাহাদুর নবাবের অনুরোধ রাখতে পারলেন না বলে দুঃখিত। সব শুনে মহারাজ মুচকে হাসলেন। বললেন : বিধিলিপি!

প্রাণদণ্ডাজ্ঞার পর মহারাজ নন্দকুমার বাইশ দিন জীবিত ছিলেন। এই বাইশ দিন একটা মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁকে বিচলিত হতে দেখা যায়নি। পূজা-আহ্নিক, নিয়মিত গীতাপাঠ, শাস্ত্রালোচনা ও সাংসারিক বিষয়ে রাজা গুরুদাসকে

উপদেশ দিয়ে তিনি সময় কাটাতে লাগলেন। অবশেষে সেইদিন এল !

* * *

৫ই আগষ্ট ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ। রোজকার মত আজও নন্দকুমার ভোরে উঠে স্নান-আহ্নিক সেরে কিছুক্ষণ গীতা পাঠ করলেন। তারপর গুন্ গুন্ করে রামপ্রসাদী গান গাইতে লাগলেন।

মহারাজের সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের জন্য পাশের ঘরে আত্মীয় বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরা ইতিমধ্যে এসে জড় হতে লাগলেন। একপাশে ক্লেবারিং, মনসন্ ও ফ্রান্সিস অপেক্ষা করছেন। নন্দকুমার পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই তাঁরা অভিবাদন করে বললেন ঃ আমাদের স্বজাতীয়ের আচরণে আমরা গভীর লজ্জা বোধ করিতেছি।

নন্দকুমার হাতজোড় করে বললেন ঃ আপনাদের ভদ্রতা ও সৌজন্যে আমি মুগ্ধ। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

সাহেবেরা বিদায় গ্রহণ করলেন। মহারাজ তখন ক্রন্দনরত আত্মীয়দের বললেন ঃ সংসারে কেউ অমর নয় ! বিচলিত হয়ো না তোমরা !

পুত্র গুরুদাসের দিকে দৃষ্টি পড়তেই মহারাজ নন্দকুমার বললেন ঃ আমি ত চলে যাচ্ছি, কিন্তু তোমাদের জন্য কলঙ্কের যে দুর্ব্বিষহ কালিমা রেখে গেলাম, তোমরা তার স্মৃতি কেমন করে মুছবে গুরুদাস ! আমার বংশধরেরা চিরকালই কি

জালিয়াতের বংশ বলে পরিচিত হবে? না, না, সে হবে না। সে কখনো হতে পারে না। একদিন বিশ্ববাসী জানবে— নন্দকুমার সত্যিই নির্দোষ ছিলেন। আর আমি এ-ও বলে যাচ্ছি, সেদিনের আর বেশী দেরী নেই।

দরজায় শেরিফ ম্যাক্রবি মহারাজকে নীরবে অভিবাদন করেন। মহারাজ ব্রাহ্মণদের প্রতি তাঁর দেহরক্ষার জন্য অনুরোধ করে শেরিফকে বললেন: আমি প্রস্তুত! বধ্যভূমিতে চলুন।

মহারাজ নন্দকুমারকে শেষ দেখা দেখবার জন্য রাস্তার দু'পাশে অসংখ্য লোক এসে জড় হয়েছে। ভীড় ঠেলে মহারাজ নন্দকুমারের শিবিকা-বাহকেরা মন্থরগতিতে এগিয়ে চলেছে। মহারাজের দিকে তাকিয়ে জনতার কেউ কেউ হাত তুলে প্রণাম করছে। কেউ বা নীরবে, কেউ ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

শেরিফ ম্যাক্রবি একজন সৎপ্রকৃতির ইংরাজ ছিলেন। মহারাজ নন্দকুমারের শেষ কয়েকটা মুহূর্ত্ত সম্বন্ধে তিনি যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তার থেকে আমরা উদ্ধৃত করছি:

"...আমরা বধভূমিতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, ময়দান লোকে লোকারণ্য। সেই বিরাট্ জনতা কিন্তু শান্ত ও অচঞ্চল। মহারাজ পাল্কীতে বসেই একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিলেন। ফাঁসি-মঞ্চের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ল। কিন্তু মহারাজের মুখে উদ্বেগ বা ভীতির চিহ্নমাত্রও লক্ষ্য করলাম না।...দৃঢ়

পদক্ষেপে বধমঞ্চের দিকে যেতে লাগলেন। তাঁর হাত দুখানি বস্ত্রখণ্ড দিয়ে বাঁধা হল। যে তিনজন ব্রাহ্মণের উপর মহারাজ তাঁর দেহরক্ষার ভার দিয়েছিলেন, তাঁরা কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু মহারাজ নির্বিবকার। অবশেষে বস্ত্র দ্বারা তাঁর মুখখানি ঢেকে দেবার জন্য আমি জনৈক ব্রাহ্মণ-সিপাইকে আদেশ করলাম। মহারাজ ইঙ্গিতে আমাকে বারণ করে পদতলে লুণ্ঠিত ব্রাহ্মণকে এ কাজ করবার জন্য আদেশ দিলেন। তাঁর মুখাবয়ব তখনো সৌম্য, শান্ত। অবশেষে ফাঁসির দড়ি গলায় সংলগ্ন করবার জন্য তিনি পদ সঞ্চালন করে ইঙ্গিত দিলেন। এ দৃশ্য দেখবার মত মানসিক শক্তি আমার ছিল না। আমি পাল্কীর ভেতর আত্মগোপন করলাম। পরক্ষণেই মঞ্চ অপসরণের শব্দ শুনলাম। সব শেষ হয়ে গেছে।…মহারাজের হস্তদ্বয় যেমন বাঁধা ছিল তেমনি আছে। অবিকৃত মুখমণ্ডল শান্ত সৌম্যভাব !”…

মহারাজ নন্দকুমারের শেষ ইচ্ছা ব্যর্থ হয়নি। ক’বছর বাদে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিচার-সভায় মহামান্য এডমাণ্ড বার্ক নন্দকুমারকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করেছিলেন।

বার্ক তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন: হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে মহারাজা নন্দকুমার যখন সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় তাঁর বিরুদ্ধে এক ভূয়ো মামলা সাজিয়ে, তার চেয়েও ভূয়ো এক আইনের দোহাই পেড়ে, জজেরা মহারাজ নন্দকুমারের

ফাঁসি দিলেন! কোম্পানীর অত্যাচার থেকে ভারতবাসীদের রক্ষা করবার জন্য যে জজদের কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল, তাঁরা—ভারতের যাহা কিছু পবিত্র ও সম্ভ্রান্ত তার অপমান করে হেষ্টিংসের প্রতিদ্বন্দ্বী নন্দকুমারকে ফাঁসিগাছে ঝুলিয়ে দিলেন!···স্বৈরাচারী বড়লাট হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার আর কেউ রহিল না। বাদী নন্দকুমারকে ফাঁসি দিয়ে আসামী হেষ্টিংস জয়লাভ করলেন!

সমাপ্ত